হিমতীর্থ পঞ্চকেদার

সাহিত্য মন্দির
৫৭-সি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
কলিকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ :
ঝুলনযাত্রা, ১৩৬৪

প্রচ্ছদ :
এস, এন, বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
নিশীথকুমার ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণী, কলি-৬

উৎসর্গ

যার উৎসাহ এবং সাহচর্যে হিমালয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে, সেই অগ্রজ-প্রতিম বঙ্কিমচন্দ্র সরকারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

এই লেখকের অন্যান্য বই—

রূপবতী তমসা [তমসা গাড়োয়াল]

তুষারতীর্থ অমরনাথ গুহাতীর্থ বৈষ্ণোদেবী
[সমগ্র কাশ্মীর]

মণিমহেশ ত্রিলোকনাথ [হিমাচল]

অমরাবতী অমরকণ্টক রূপতীর্থ চিত্রকূট

মুক্তিতীর্থ মুক্তিনাথ [সমগ্র নেপাল]

কিন্নর কৈলাশ

হিমতীর্থ পঞ্চকেদার

স্বর্গ কোথায় আছে জানি না। শুনেছি দেবতারা নাকি সেখানে বাস করেন। দুঃখ, দারিদ্র্য, হতাশা, সেখানে অনুপস্থিত। সর্বত্র প্রাচুর্য, সুখ আর শান্তি। এই স্বর্গ, মর্তে্যর মানুষের কাছে কল্পলোক।

আমার কাছে কিন্তু এহেন স্বর্গের একটা বাস্তব অস্তিত্ব আছে। স্বর্গের যাবতীয় সুষমা আমি সেখানে মনে প্রাণে অনুভব করি। আমার সেই স্বর্গ হচ্ছে হিমালয়। সে যেন মণিমুক্তাখচিত, রত্নালঙ্কারে শোভিত জ্যোতির্ময় এক উন্মুক্ত দেবালয়। তাই আমার কাছে হিমালয়ে যাওয়া, শুধু লোকালয় থেকে হিমালয়ে নয়—লোকালয় থেকে দেবালয়ে। মর্ত্য থেকে স্বর্গে।

....দিগন্তব্যাপী তুষারশুভ্র হিমগিরি। মাথার উপর নীল আকাশের কোলে মেঘের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা। গিরিশৃঙ্গ থেকে নেমে আসে শত সহস্র অমৃতধারা—গঙ্গা, যমুনা, মন্দাকিনী, অলকানন্দা— । জীবের কল্যাণে বয়ে চলে সমতলের দিকে। পদপ্রান্তে সবুজের সমারোহ। ফল-ফুলে ভরা শস্য শ্যামল উপত্যকা।

প্রকৃতির এই সুমধুর অঙ্গনে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে একদল সাধারণ মানুষ। সরল শান্ত অনাড়ম্বর যাদের জীবন। মানুষ হয়েও যারা দেব-চরিত্রের সুষমায় মণ্ডিত।

..হিমালয়ের এই পুণ্যক্ষেত্র সমতলের মানুষের কাছে তীর্থক্ষেত্র। বিশেষ করে কেদারখণ্ড। উত্তরাপথের শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি। মন্দাকিনী অলকানন্দার মধ্যবর্তী অমৃতধারাবিধৌত হিমগিরির এই পুণ্যখণ্ডে দেবাদিদেব মহাদেব পঞ্চকেদার রূপে প্রকাশিত। কেদারনাথ, মদমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ, কল্পেশ্বর।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে পুরাণবর্ণিত দ্বাপরযুগের এক উপাখ্যান।

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবগণ বিজয়ী হলেও জ্ঞাতিবধহেতু গভীর শোকে মুহ্যমান। প্রায়শ্চিত্তের জন্য হিমালয়ে গমন করেন। সেখানে দেবাদিদেব মহাদেবকে তুষ্ট করার মানসে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হন। মহাদেব ধরা দিতে অনিচ্ছুক। চোখের আড়ালে লুকিয়ে বেড়ান। হঠাৎ একদিন মধ্যম পাণ্ডব ভীম মহিষরূপী মহেশ্বরকে দেখতে পেয়ে পিছন দিক থেকে জাপ্‌টে ধরেন। মহেশ্বর অনন্যোপায় হয়ে ধরণীগর্ভে প্রবেশ করেন। অবশ্য পশ্চাৎভাগ উপরেই থেকে যায়।

হিমালয়ের এই কেদারখণ্ডে পঞ্চতীর্থ পঞ্চকেদারের অবস্থান। প্রথম, মূল কেদারে মহিষরূপী মহেশ্বরের পশ্চাদ্ অংশ। দ্বিতীয়, মদ্‌মহেশ্বরে নাভি। তৃতীয়, তুঙ্গনাথে বাহু। চতুর্থ, রুদ্রনাথে মুখ। পঞ্চম, কল্পেশ্বরে জটা।

পাণ্ডবগণ এই পঞ্চকেদারে আশুতোষকে তুষ্ট করে পাপমুক্ত হন।

....এই তপঃক্ষেত্রে নিরন্তর যাত্রীপ্রবাহ চলে। অন্তরে ভক্তির হোমাগ্নি শিখা, করপুটে ব্রহ্মকমল।

শোক-তাপ-দুঃখ জর্জরিত হৃদয় নিয়ে আশুতোষের করুণা লাভের আশায় পথ চলে, এই পঞ্চকেদারের পথে। —হিমতীর্থ পঞ্চকেদারে

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা প্রসঙ্গে :

চার বছরে পঞ্চম মুদ্রণ ভ্রমণ সাহিত্যে সত্যিই অভাবনীয় এবং আনন্দের। এর মূলে অবশ্য বাঙালীর অসীম হিমালয় প্রীতি। ....এই পঞ্চম সংস্করণ প্রসঙ্গে যেটা আসল কথা, সেটা হচ্ছে নামের পরিবর্তন। ছিল 'হিমগিরি তীর্থপথে' হ'ল 'হিমতীর্থ পঞ্চকেদার'। নামের এই পরিবর্তনের প্রেরণা শুধু প্রকাশকের কাছ থেকেই নয়। অনেক পাঠকের কাছ থেকেও পেয়েছি। তাঁদের বক্তব্য—'হিমগিরি তীর্থপথে' নামের মধ্যে হিমালয়ের কোন অংশের বর্ণনা বা তার কোন আভাষ মেলে না! ....বেশ তো, আমিই বা আপত্তি করি কেন! —হোক পরিবর্তন, প্রকাশিত হোক নতুন নামে।
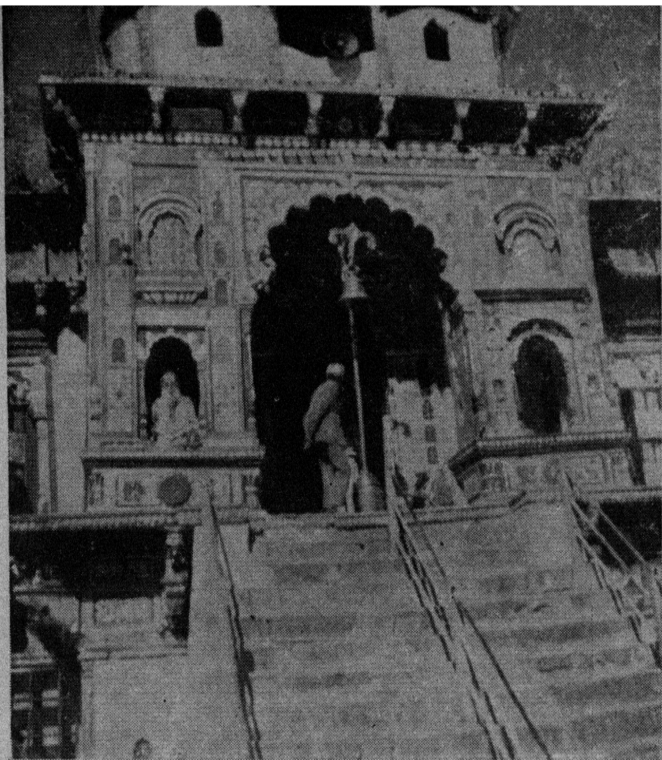
বদ্রীনারায়ণ
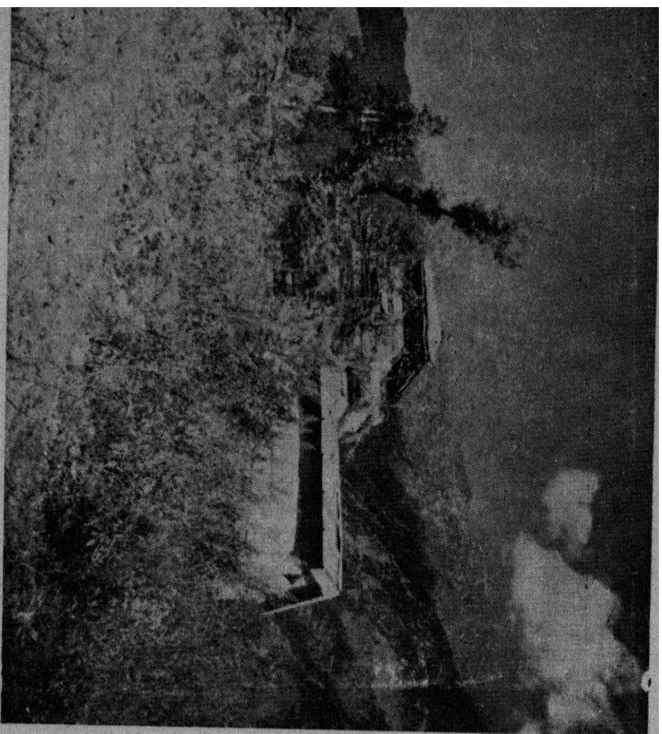
ধ্যানবদ্রীর মন্দির (উর্গম)

অনসূয়া দেবীর মন্দির
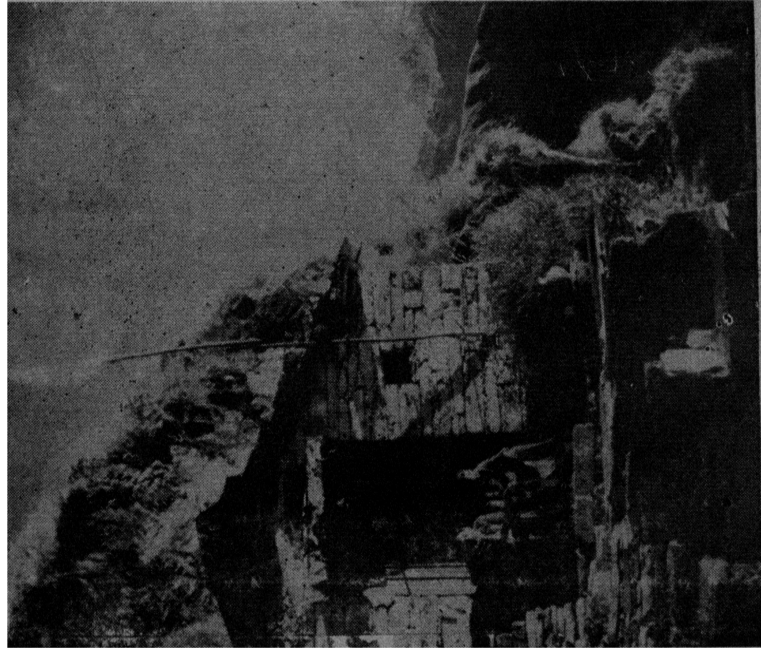
রুদ্রনাথের মন্দির (গুহামন্দির)
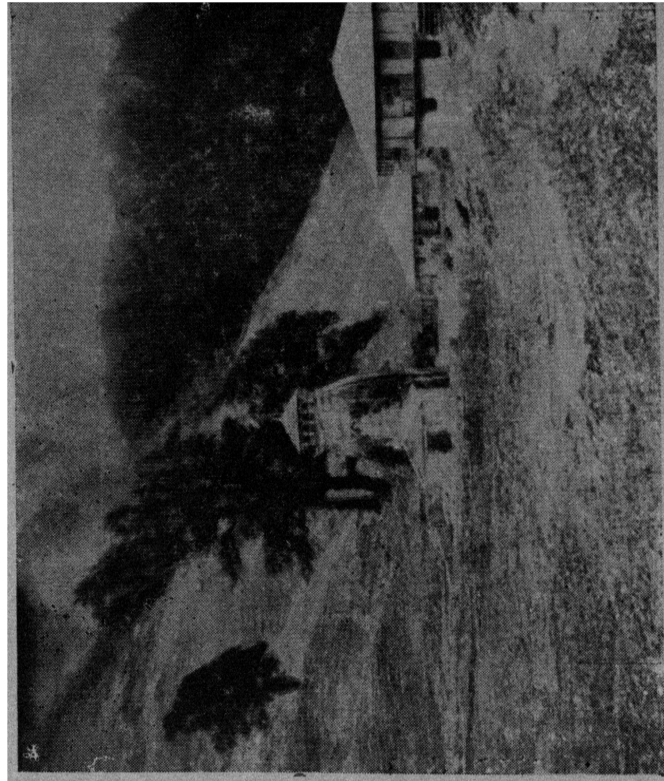
মনোরম উপত্যকার মাঝখানে মদমহেশ্বরের মন্দির।
পাশেই অতিথিশালা।
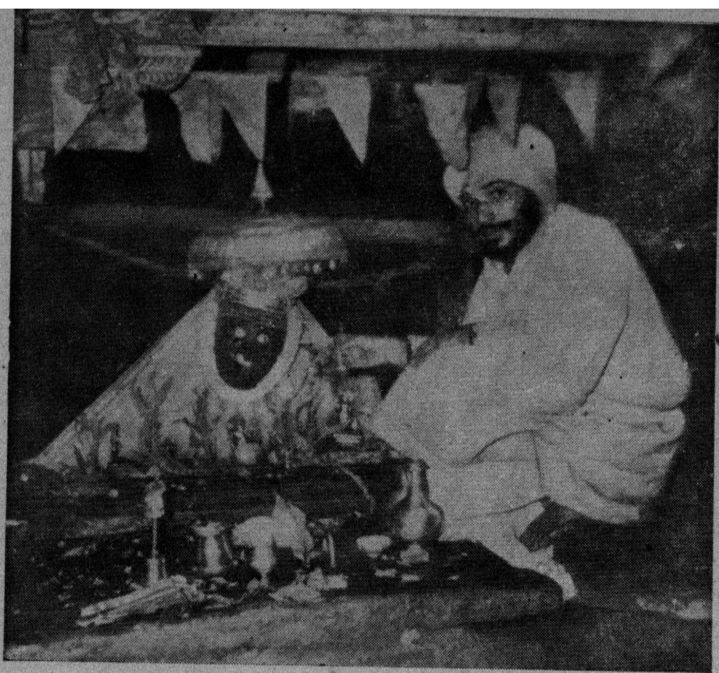
রুদ্রনাথের মুখমূর্তি (রাজবেশ)।
পাশে পূজারী প্রয়াগদত্ত ভাট্

কালীমঠ সংলগ্ন কালীগঙ্গার
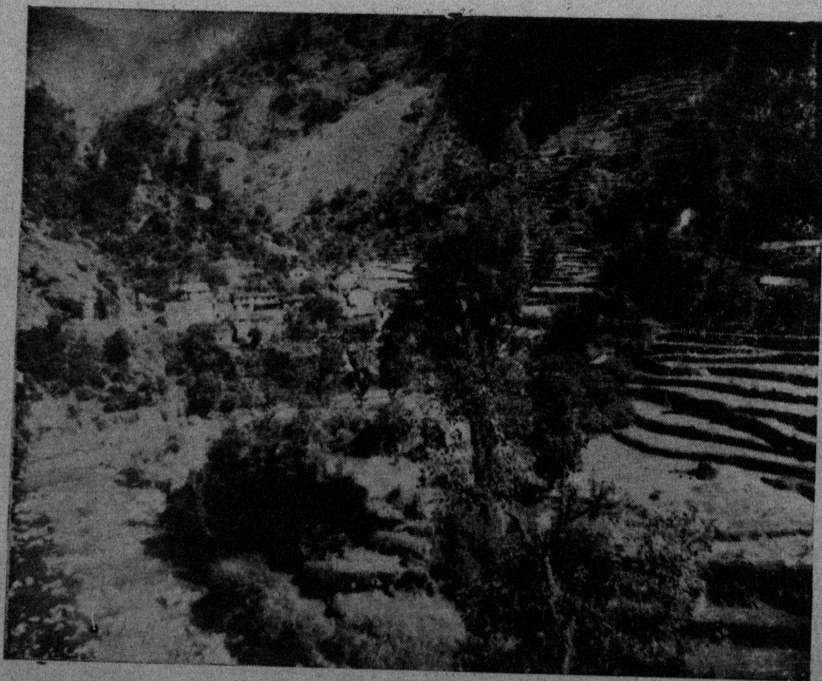
হিমগিরি তীর্থপথে

স্বর্গ কোথায় আছে জানি না। শুনেছি দেবতারা নাকি সেখানে বাস করেন। দুঃখ, দারিদ্র্য, হতাশা, সেখানে অনুপস্থিত। সর্বত্র প্রাচুর্য, সুখ আর শান্তি। এই স্বর্গ, মর্ত্যের মানুষের কাছে কল্পলোক।

আমার কাছে কিন্তু এহেন স্বর্গের একটা বাস্তব অস্তিত্ব আছে। স্বর্গের যাবতীয় সুষমা আমি সেখানে মনে প্রাণে অনুভব করি। আমার সেই স্বর্গ হচ্ছে হিমালয়। সে যেন মণিমুক্তাখচিত, রত্নালঙ্কারে শোভিত জ্যোতির্ময় এক উন্মুক্ত দেবালয়। তাই আমার কাছে হিমালয়ে যাওয়া, শুধু লোকালয় থেকে হিমালয়ে নয়—লোকালয় থেকে দেবালয়ে। মর্ত্য থেকে স্বর্গে।

...দিগন্তব্যাপী তুষারশুভ্র হিমগিরি। মাথার উপর নীল আকাশের কোলে মেঘের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা। গিরিশৃঙ্গ থেকে নেমে আসে শত সহস্র অমৃতধারা—গঙ্গা, যমুনা, মন্দাকিনী, অলকানন্দা—। জীবের কল্যাণে বয়ে চলে সমতলের দিকে। পদপ্রান্তে সবুজের সমারোহ। ফল-ফুলে ভরা শস্য শ্যামল উপত্যকা।

প্রকৃতির এই সুমধুর অঙ্গনে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে একদল সাধারণ মানুষ। সরল শান্ত অনাড়ম্বর যাদের জীবন। মানুষ হয়েও যারা দেবচরিত্রের সুষমায় মণ্ডিত।

...হিমালয়ের এই পুণ্যক্ষেত্র সমতলের মানুষের কাছে তীর্থক্ষেত্র। বিশেষ করে কেদারখণ্ড। উত্তরাপথের শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি। মন্দাকিনী অলকানন্দার মধ্যবর্তী অমৃতধারাবিধৌত হিমগিরির এই পুণ্যখণ্ডে দেবাদিদেব মহাদেব পঞ্চ-কেদাররূপে প্রকাশিত। কেদারনাথ, মদমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ, কল্পেশ্বর।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে পুরাণবর্ণিত দ্বাপরযুগের এক উপাখ্যান।

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবগণ বিজয়ী হলেও জ্ঞাতিবধহেতু গভীর শোকে

মুহ্যমান। প্রায়শ্চিত্তের জন্য হিমালয়ে গমন করেন। সেখানে দেবাদিদেব মহাদেবকে তুষ্ট করার মানসে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হন। মহাদেব ধরা দিতে অনিচ্ছুক। চোখের আড়ালে লুকিয়ে বেড়ান। হঠাৎ একদিন মধ্যম পাণ্ডব ভীম মহিষরূপী মহেশ্বরকে দেখতে পেয়ে পিছন দিক থেকে জাপ্‌টে ধরেন। মহেশ্বর অনন্যোপায় হয়ে ধরণীগর্ভে প্রবেশ করেন। অবশ্য পশ্চাৎভাগ উপরেই থেকে যায়।

হিমালয়ের এই কেদারখণ্ডে পঞ্চতীর্থ পঞ্চকেদারের অবস্থান। প্রথম, মূল কেদারে মহিষরূপী মহেশ্বরের পশ্চাদ্‌ অংশ। দ্বিতীয়, মদ্‌মহেশ্বরে নাভি। তৃতীয়, তুঙ্গনাথে বাহু। চতুর্থ, রুদ্রনাথে মুখ। পঞ্চম, কল্পেশ্বরে জটা।

পাণ্ডবগণ এই পঞ্চকেদারে আশুতোষকে তুষ্ট করে পাপমুক্ত হন।

এই তপঃক্ষেত্রে নিরন্তর যাত্রীপ্রবাহ চলে। অন্তরে ভক্তির হোমাগ্নি শিখা, করপুটে ব্রহ্মকমল।

শোক তাপ-দুঃখ জর্জরিত হৃদয় নিয়ে আশুতোষের করুণা লাভের আশায় পথ চলে, এই পঞ্চকেদারের পথে।—হিমগিরি তীর্থপথে।

লোকালয় থেকে হিমালয়

॥ ১ ॥

লোকালয় থেকে হিমালয়। বারে বারে মনকে টানে। যখনই সময় পাই হাতে কিছু পয়সাও থাকে তখনই বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। হিমালয়ের পথে পথে। কী প্রচণ্ড তার আকর্ষণ—।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, বারে বারে হিমালয়ে যাও কেন? কী আছে সেখানে? জবাব দিতে পারি না। কারণ হিমালয়ে কি আছে আর কি নেই, তার হিসাব তো কোনদিন করি নি। করার ইচ্ছাও জাগেনি।

তিরিশ বছর আগে প্রথম আমার হিমালয় দেখা। প্রথম দর্শনেই প্রেম। তারপর যতদিন গেছে ততই বন্ধন দৃঢ় হয়েছে। এখন তো আত্মার আত্মীয়।

সময় পেলেই ছুটে যেতে ইচ্ছে করে। হিমালয়ের পথে পথে নিজেকে হারিয়ে খুঁজতে সে যে কী আনন্দ।

সে বছর গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাওয়ার পথে চীরবাসার কাছে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ি। শ্বাসের কষ্ট। অগত্যা চীরবাসাতেই থেকে যেতে হয়। একমাত্র আস্তানা পি, ডব্লু, ডি'র সেই কুঠুরী।

পরদিন সকালে গঙ্গোত্রীতে নেমে আসি।

স্ত্রী পুত্র কন্যা ছাড়া সঙ্গে তিন বন্ধুও ছিল। উদয় ভট্টাচার্য, অনাথ মজুমদার আর সমীর মুখার্জী। তাদের জন্য দুঃখ হচ্ছিল। এতদূর এসেও আমার জন্য তাদের গোমুখ যাওয়া হ'ল না।

শরীর খারাপের জন্য মনে মনে ভয় পেয়ে গেলাম। হিমালয়ের পথে চলার সামর্থ্য কি তবে হারিয়ে ফেলছি? চড়াই উৎরাই-এর পথ চলার ক্ষমতা কি শেষ হতে চলেছে?

নিশ্চয় না। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করি। এ অসুস্থতা সাময়িক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

হৃষিকেশ থেকে যাত্রা করার আগে কয়েকদিন জ্বরে ভুগেছিলাম। বেশ কিছু ক্যাপস্থুলও গিলতে হয়েছে। এ নিশ্চয় তারই ফল।

বেশ তো, সামর্থ্যটা এবার বোঝা যাবে।

পঞ্চকেদার পরিক্রমায় বের হব মনস্থ করলাম।

বন্ধু যতীনদাও যেতে আগ্রহী। বয়স তেষট্টী হ'লে কি হবে মনে তেত্রিশের সাহস।

আমি স্ত্রী পুত্র কন্যা আর যতীনদা। এই পাঁচজন। বয়স যথাক্রমে,—সাতচল্লিশ, সাঁইত্রিশ, বার, পনের, তেষট্টি।

অনেকেই বারণ করলেন একসঙ্গে পঞ্চকেদার না করতে।

সবশুদ্ধ প্রায় দু'শ মাইল হাঁটাপথ। যাত্রীরা সাধারণতঃ নাকি দু'বারে এই পরিক্রমা শেষ করেন।

দেখা যাক। যতটা পারি যাব। তাছাড়া হিমালয়ে পথ চলার ব্যাপারে জোর করে কিছু বলা যায় না। আবহাওয়া পরিবেশ আর শরীর,—এ তিনের সমন্বয়ে চলতে হবে। অতএব আগে থাকতে চিন্তা করে লাভ নেই।

বেশ কয়েকমাস আগেই রেলের রির্জাভেসান করে ফেললাম। নিরাপত্তা ছাড়া আমার কাছে এর একটা অন্য উদ্দেশ্যও আছে। টিকিট কাটা হয়ে গেলে আমি মনে মনে ভ্রমণের একটা প্রাক্-আনন্দ

অনুভব করি। যেমন মহালয়ার চণ্ডীপাঠ থেকেই পূজার উন্মাদনা সুরু।

যাত্রার দিন আগতপ্রায়। কাজেরও শেষ নেই। মাথা খাটিয়ে সবকিছু ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।

সকলের নামে নামে কলেরা বসন্তের টিকা নেওয়ার ডাক্তারী সার্টিফিকেট নিতে হবে।

শীতের উপযোগী বিছানাপত্র। গরম জামা-কাপড়। মোজা দস্তানা মাঙ্কিক্যাপ। রোদের জন্য টুপি। ক্রেপসোলের জুতো। জলের জায়গা। পথের জন্য কিছু শুকনো ফল ও অন্যান্য খাবার। বিশেষ করে ছোলা বাদাম কিস্‌মিস্। আগের দিন রাত্রে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন খেতে খেতে পথ চলা।

সবরকমের কিছু ওষুষপত্র অবশ্যই নিতে হবে। বিশেষ করে জ্বর, সর্দিকাশি, গা-হাত-পা-ব্যাথা, আমাশয় ইত্যাদি।

স্থানীয় লোকেরা যাত্রীদের কাছে 'দাওয়ায়' প্রত্যাশা করে।

আজন্ম প্রকৃতির কোলে লালিত মানুষগুলো সামান্য একটা ট্যাবলেট্ খেলেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তাই তাদের কাছে সামান্য ওষুধও অসামান্য।

আজ মহালয়া। দেবীপক্ষের সুরু। পুজোর মেজাজ পুরোদমে জমে উঠেছে। আমাদের মেজাজ আরও তুঙ্গে। একে পুজো তার উপর পঞ্চকেদারের আকর্ষণ।

আর মাত্র একটা রাত। আগামীকাল দেরাদুন এক্সপ্রেসে রওনা হ'ব।

গাড়ী ছাড়ার এক ঘণ্টা আগে ষ্টেশনে পৌঁছে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ীও প্ল্যাটফরমে হাজির।

গাড়ীতে উঠে মালপত্র গুছিয়ে রেখে জায়গায় বসে পড়লাম। কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব শুভেচ্ছা জানাতে ষ্টেশনে এসেছেন। ঐ দুর্গমপথে সাবধানে পথ-চলার কথা সকলে মনে করিয়ে দেন।

ঘণ্টা বাজল। সবুজ আলোর সংকেত পেতেই গাড়ী নড়ে উঠল। চলতে সুরু করল। যেন বিরাট এক দৈত্য শৃঙ্খল ছিঁড়ে এগোচ্ছে। ক্রমশঃ জোরে। তীব্র বেগে।

সারারাত সারাদিন। আবার সারারাত।

বর্দ্ধমান পাটনা বেনারস অযোধ্যা লক্ষ্ণৌ মোরাদাবাদ। আনন্দে উল্লাসে শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে ক্ষণিকের শুধু বিশ্রাম।

অবশেষে হরিদ্বার। বৈকুণ্ঠের প্রবেশ-পথ। একেবারে হৃষিকেশ গিয়ে নামলেই পারতাম। কিন্তু না।

সর্বাগ্রে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতে হবে। তার পর যেখানে খুশী যাও।

এ সংস্কার শুধু আমার একার নয়। বহু লোককে দেখেছি—কেদারনাথ কিংবা বদ্রীনারায়ণ, যমুনোত্রী কিংবা গঙ্গোত্রী যেখানেই যাক্, সর্বাগ্রে ব্রহ্মকুণ্ডে একটা ডুব দিয়ে নেবেই।

হরিদ্বার-হৃষিকেশ-লছমনঝুলা

॥ ২ ॥

হরিদ্বারে নেমেই টাঙ্গাওয়ালাকে বলে দিলাম—চল বিড়লাঘাট ভোলাগিরি সন্ন্যাস আশ্রম।

এই আশ্রমের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ করিয়ে দেন পরম সুহৃদ শ্রীকল্যাণব্রত সেনগুপ্ত মহাশয়। নামের সঙ্গে স্বভাবের সুন্দর মিল। পরের কল্যাণে তিনি সদাব্রত।

এবারও সেখানে গিয়ে উঠলাম। কিন্তু প্রথমেই একটা বিরাট শূন্যতা অনুভব করলাম।

এই আশ্রমের প্রাণ-পুরুষ শ্রীশ্রী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি মহারাজ মাত্র দু'মাস আগে দেহরক্ষা করেছেন।

স্মৃতিপটে ভেসে উঠে,—সেই শান্ত সৌম্য মুখে করুণাঘন হাসি। যেন আশীর্বাদের স্নিগ্ধধারা। বারে বারে পেয়েছি উৎসাহ, প্রেরণা। এগিয়ে চলার সাহস।

আজ তিনি নেই। কিন্তু তাঁর আশীর্বাদ নিশ্চয় আছে।

হরিদ্বার। যার অস্তিত্ব খৃষ্টজন্মের হাজার বছর আগেও ছিল। পরিব্রাজক হুয়েন সাং এই পুণ্যভূমির সৌন্দর্যে মুগ্ধ অভিভূত হয়েছিলেন। ইতিহাসে তার সাক্ষ্য মেলে। সেই রোমাঞ্চকর অনুভূতি আজও অম্লান।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে খানিকটা এগুলে প্রথমেই দৃষ্টি কেড়ে নেয় মহাদেবের জটানিঃসৃত গঙ্গাপ্রবাহ। সুরুতেই চমক্।

হরিদ্বারের প্রধান আকর্ষণ অবশ্যই গঙ্গা, মূলতঃ এখানেই গঙ্গার সমতলে অবতরণ। তবুও সমতলের স্থিরতা এখানে নেই। ছোটবড় অসংখ্য পাথরের ঘাত-প্রতিঘাতে সতত অস্থির ও মুখর।

আমার মনে হয় একমাত্র হরিদ্বারের গঙ্গা সর্বশ্রেণীর মানুষকে আকর্ষণ করে। কাছে টানে।

কেউ পায় মনের শান্তি, কেউ পায় দেহের শক্তি। আবার কেউ পায় দেহমনের অতিরিক্ত একটা নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি।

আকর্ষণের আরও উপকরণ আছে।

ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটের পাশে মন্দিরে আছে ভগবান বিষ্ণুর চরণ-চিহ্ন। মায়াদেবীর মন্দির। বিগ্রহ,—চতুর্ভুজা মা দুর্গা। তা ছাড়া গৌরীকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, সপ্তধারা, পিছোড়নাথ, ভৈরব, নারায়ণ-শিলা।

ব্রহ্মকুণ্ডের কাছে অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে ভারত মাতার বীর সন্তান নেতাজী সুভাষ।

যাত্রীরা সময় পেলেই ছুটে যান কন্‌খলে। দক্ষরাজার প্রাসাদ, ঘাট ও নাগেশ্বরের মন্দির দেখতে।

তারপর পাহাড় থেকে পাহাড়ে। মনসা চণ্ডী মায়াবতী গুরুকুল।

ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহন স্নানের আশা এবারে পূর্ণ হ'ল না। গঙ্গায় জল নেই। বাঁধের বাধায় গঙ্গার ধারা এপাশে আসতে পারছে না। তির তির করে যা একটু আসছে তাতেই আঁচল ভরে জল তুলে নিয়ে সর্বাঙ্গে মেখে নিলাম।

সযত্নে লালিত হরিদ্বারের সুখস্মৃতি প্রথমেই একটা ধাক্কা খেল।

ধারাবিহীন গঙ্গা হরিদ্বারের সকল আকর্ষণকে যেন ম্লান করে দিয়েছে।

যাই হোক ফেরার পথে সব পুষিয়ে নেওয়া যাবে। এখন শুধু এগিয়ে যাবার চিন্তা।

হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ। কুড়ি কিঃ মিঃ পথ। বাস, টাঙ্গা, ট্যাক্সি সবই চলে। আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হ'লাম। তখন সকাল সাতটা।

মোতিবাজার ছাড়িয়ে ভীমগোড়া। তারপর সত্যনারায়ণের মন্দির। থেমে থেমে দেখে দেখে চলেছি। আবহাওয়া তেমন ভাল

নয়। কার্তিকের মাঝামাঝি। তবুও বর্ষা যেন শেষ হতে চাইছে না।

হৃষিকেশ। উচ্চতা ১১৪০ ফুট। এই হৃষিকেশ সম্বন্ধে এক পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত।

বহুকাল আগে এখানে ছিল রৈভ্য ঋষির আশ্রম। মহামুনি ভরদ্বাজ ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। একদিন ভরদ্বাজ মুনির পুত্র যবক্রীত রৈভ্যঋষির পুত্রবধূকে কামনা করে। এতে রৈভ্যঋষি ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং নিজের কেশ ছিঁড়ে আগুনে আহুতি দেন। সেই আগুনের ভিতর থেকে এক ভীমাকৃতি রাক্ষস বেরিয়ে আসে এবং যবক্রীতকে বধ করে। ঋষি কেশ ছিঁড়ে আগুনে আহুতি দেন তাই এ স্থানের নাম ঋষিকেশ বা হৃষিকেশ।

যাই হোক হৃষিকেশে কালী কমলীর ধরমশালার সামনে যখন পৌঁছলাম, ঘড়িতে তখন সাড়ে ন'টা।

ঘরে মালপত্র গুছিয়ে রেখে সকলে খাবারের দোকানে গিয়ে ঢুকলাম। ছেলেমেয়ে সমস্বরে বলে উঠল--গরম কচুরী আর জিলাপী।

মেয়ে কানে কানে মায়ের ইচ্ছাও যে তাই জানিয়ে দিল। মনে মনে বুঝলাম একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর খাওয়া-দাওয়া নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়ত অশোভন। তাই বড়রা ছোটদের মাধ্যমে আপন ইচ্ছাটুকু চালান করে দেয়।

আগামীকাল সকালে কেদারের পথে রওনা হব। অতএব আজই টিকিট কেটে রাখা দরকার। বাসষ্ট্যাণ্ডের কাউণ্টার থেকে অ্যাডভান্স টিকিট কেটে নিলাম।

সময় যখন রয়েছে লছমনঝোলা আর গীতাভবনটা ঘুরে এলে কেমন হয়!

প্রবল ধ্বনি ভোটে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

হৃষিকেশ থেকে লছমনঝোলা মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। ট্যাক্সিতে পাঁচ টাকা।

ঝোলাপুলের কাছে গাড়ী থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম।

পুলের এপারে ওপারে রাস্তার ধারে পাহাড়ের গায়ে ছোটবড় অসংখ্য দেবমন্দির, সাধু-সন্ন্যাসীর আখড়া। দোকানপাট, দু'চোখ ভরে দেখতে দেখতে চললাম।

কার কেমন লাগে জানি না। আমার কিন্তু এই পুল থেকে চটি-ওয়ালার হোটেল পর্য্যন্ত শান্ত ছায়াঘেরা রাস্তাটা খুব ভাল লাগে।

আরও ভাল লাগে চটিওয়ালার হোটেলের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অদ্ভুত পোষাকের কিশোরকে। কখনও শ্রীকৃষ্ণমুরারী, কখনও দক্ষিণের সেই টিকিধারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আবার কখনও,—যাক সেসব কথা।

উপস্থিত দেখছি সবাই পথশ্রমে ক্লান্ত, নিশ্চয় ক্ষিদেও পেয়েছে।

সকলে গঙ্গায় স্নান করে নিলাম। জল খুব ঠাণ্ডা, তবে স্নান করে খুব আরাম।

খাওয়া-দাওয়া সেরে গীতাভবনে চলে এলাম, শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ। যে যার আপনমনে ঘুরে বেড়ালাম। নৈসর্গিক শোভা, গঙ্গাপ্রবাহ আর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা। কি অপূর্ব সমন্বয়! গীতা-ভবনের মধুর বৈশিষ্ট্যের মূলেও তাই।

ধর্মশালায় ফিরে এলাম। একটু বিশ্রাম করা দরকার। বিকালের দিকে আবার বেরুতে হবে। কিছু কেনাকাটা এখনও বাকী। বিশেষ করে পথের সাথী সেই লাঠি। তলায় লোহা লাগানো। আর প্লাষ্টিকের কাগজ। যা দিয়ে বৃষ্টির সময় বিছানাপত্র ঢাকতে হবে। আরও অন্যান্য টুকিটাকি যা কলকাতা থেকে আনতে ভুলে গেছি।

সকাল ছ'টায় বাস ছাড়বে। ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠে বাঁধা-ছাদা আরম্ভ করে দিলাম।

ঠিক সময়ে টাঙ্গাওয়ালাও হাজির।

বাসষ্ট্যাণ্ডে যখন পৌছলাম তখন সাড়ে পাঁচটা। লোকজন এসে গেছে। বাসও তৈরী।

মালপত্র বাসের মাথায় তুলে দিয়ে নিজেরা উঠে পড়লাম। কণ্ডাক্টর সব যাত্রীদের টিকিট মিলিয়ে নিল। এবার বাস ছাড়বে।

দেবপ্রয়াগ—রুদ্রপ্রয়াগ—গুপ্তকাশী

॥ ৩ ॥

হৃষিকেশ থেকে দেবপ্রয়াগ প্রায় আটান্ন কিলোমিটার পথ। বাসে সময় লাগে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা।

দেবপ্রয়াগ, দেবভূমির প্রথম প্রয়াগ, ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল। এই মিলিত ধারাই হচ্ছে গঙ্গা। প্রকৃতপক্ষে গঙ্গার জন্মভূমি এই দেব প্রয়াগ।

উচ্চতা প্রায় ১৫০০ ফুট।

এখান থেকে শ্রীনগর রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে যেমন কেদারবদ্রী যাওয়া যায় তেমন টিহরী হয়ে যমুনোত্রী গঙ্গোত্রীর পথেও পাড়ি জমানো যায়।

প্রায় ন'টা নাগাদ আমরা দেবপ্রয়াগ পৌঁছে গেলাম।

মাত্র ১৫।২০ মিনিট বাস দাঁড়ায়। এই অল্প সময়ের মধ্যে দেব-প্রয়াগের কিছুই দেখা সম্ভব নয়। তাই যাত্রীরা এই সময়টুকু চা জল-খাবার নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। অথচ এই দেবপ্রয়াগে দেখার এবং জানার অনেক কিছুই আছে।

যখন হাঁটাপথ ছিল তখন এ স্থানের বিরাট একটা আকর্ষণ ছিল। আজকাল যাত্রীরা দ্রুতগামী বাসে চড়ে কেদার-বদ্রী ছুটে যান। ভুলেও একবার এখানে থামেন না। এভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে আরও অনেক প্রাচীন সমৃদ্ধ তীর্থস্থান। রুদ্রপ্রয়াগ গুপ্তকাশী উখীমঠ আরও আরও অনেক।

দেবপ্রয়াগ একট শৈল সহর। প্রয়োজনের সব কিছুই এখানে মেলে। তবে বিলাস ও ভোগের আধুনিক উপকরণ এখানে অনুপস্থিত। তাই হয়ত তীর্থযাত্রী ছাড়া বিশেষ কেউ এখানে আসেন না।

কিন্তু এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে চোখ জুড়িয়ে যায়।

রাস্তা থেকে অনেক উঁচুতে টিহরীরাজ প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথজীর মন্দির। বিগ্রহ রঘুনাথ অর্থাৎ রামচন্দ্র। পাশে জানকী।

এই মন্দিরের বেশ কিছু উপরে ক্ষেত্রপালের মন্দির। যাত্রীরা ক্ষেত্রপালের পূজা দিয়ে পরে রঘুনাথজীকে দর্শন করতে যান।

দেবপ্রয়াগের প্রধান আকর্ষণ ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গম। ভাগীরথী উদ্দাম। অলকানন্দা তুলনায় শান্ত।

সিঁড়ি নেমে এসেছে সঙ্গমের জলে।

পাশেই বাঁধান জায়গা, পিতৃপুরুষকে পিণ্ড দেবার প্রশস্ত ক্ষেত্র। যাগযজ্ঞ পূজা পার্বণ সব কিছুরই সুবন্দোবস্ত আছে।

দেবপ্রয়াগ—। পুত পবিত্র এই প্রয়াগ।

বামন অবতারের পায়ের নখ থেকে নির্গত জলধারা ব্রহ্মলোকে প্রবাহিত হ'ল। সেখান থেকে বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন নাম নিয়ে বয়ে চলল। তারই একটি ধারা আশ্রয় নিল গিরিরাজ হিমালয়ের বুকে। নাম হল গঙ্গা।

দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে নিজের জটায় ধারণ করলেন। ভগীরথ মহাদেবকে তুষ্ট করে গঙ্গাকে নিয়ে চললেন মর্তে। পথে গঙ্গা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। সেই দুই ধারা আবার মিলিত হল। —এই দেবপ্রয়াগে।

দেবপ্রয়াগ থেকে শ্রীনগর। দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার। গাড়োয়ালের একটি প্রাচীন সহর। রাজধানীও বটে।

এখানে যাত্রীদের কোন অসুবিধা হয় না। টুরিষ্ট অফিস, রেষ্ট-হাউস, হোটেল সব কিছুই আছে।

বদ্রীনারায়ণ থেকে ফেরার পথে একদিনে শ্রীনগর পর্য্যন্ত আসা যায়। যাত্রীদের তাই বাধ্য হয়ে এখানে রাত কাটাতে হয়।

শ্রীনগর থেকে এবার রুদ্রপ্রয়াগ। ২৭ কিলোমিটার পথ।

রুদ্রপ্রয়াগ। কেদারনাথের মন্দাকিনী বদ্রীনাথের অলকানন্দা এখানে মিলিত হয়েছে, এই পুণ্যক্ষেত্রে।

মন্দাকিনীর শান্ত স্রোতরেখা বিলীন হয়ে গেছে উচ্ছল অশান্ত অলকানন্দার বুকে।

এখান থেকে মন্দাকিনীর ধারা অনুসরণ করে যাত্রীরা প্রথমে যান কেদারনাথ। পরে এখানে ফিরে এসে অলকানন্দার ধারা অনুসরণ করে এগিয়ে যান বদ্রীনারায়ণের পথে।

সাধারণতঃ এটাই নিয়ম।

পুরাণে আছে প্রথমেই শুদ্ধচিত্তে কেদারনাথ দর্শন করতে হয়, তারপর বদ্রীবিশাল। তাতেই নাকি মহাপুণ্য।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে রুদ্রপ্রয়াগের উচ্চতা প্রায় ২০০০ ফুট। মাটি রুক্ষ, ফলন নগণ্য।

এককালে বাঘের উপদ্রবে এখানকার জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৬ সাল। এই আটটি বছর সেই মানুষ-খেকো চিতাটা এই এলাকায় বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। উদরে পুরেছিল প্রায় দেড়শ মানুষ।

অসহায় মানুষের আর্তনাদ শুনে এগিয়ে এলেন সাহসী শিকারী জিম্ করবেট্। বিনাশ করলেন সেই নরখাদককে। সেদিনের সেসব কাহিনী তিনি নিজেই লিখে গেছেন, "দি ম্যান ইটিং লেপার্ড অব রুদ্রপ্রয়াগ" গ্রন্থে।

আজও স্থানীয় লোকেরা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করে। প্রতি বছর তাঁর নামে এখানে মেলা বসে।

রুদ্রপ্রয়াগের সঙ্গমস্থলের আর এক নাম সূর্য্যপ্রয়াগ। এখানে বসে দেবর্ষি নারদ দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করেছিলেন।

এখানকার স্রোত ভয়ঙ্কর। স্নানের ঘাট আছে। তবে কেউ নামতে সাহস পান না, ঘটি দিয়ে স্নান সেরে নেন।

ঘাট থেকে সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলে রুদ্রনাথের মন্দির। সুন্দর ছোট্ট মন্দিরটি। বিগ্রহ শিবলিঙ্গ। মন্দিরে ছোট দুটি কুঠরী। একটিতে আছেন নারদেশ্বর শিব। অন্যটিতে কামেশ্বর মহাদেব।

এখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে আরও উপরে উঠে গেলে মহাশক্তি-রূপিনী দেবী অন্নপূর্ণা। এখানে তিনি কৃপণ। আবাদের জমি কম। ফলন নগণ্য। তাই জীবন কষ্টসাধ্য। তবে বর্তমানে অনেক জনহিত-কর প্রকল্পের কাজ চলছে। স্থানীয় অধিবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সরকার থেকে বিশেষ প্রচেষ্টাও চলছে।

অতীতের জঙ্গলাকীর্ণ রুদ্রপ্রয়াগ, যেখানে মাত্র একটি ধর্মশালা আর ৪।৫ ঘর গৃহস্থ বাস করতেন আজ রীতিমত সহর। দোকানপাট, হাটবাজার, হোটেল, স্কুল, রেষ্টহাউস, হাসপাতাল সব আছে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিদ্যুতের আলো।

শুনলাম রুদ্রপ্রয়াগের এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পিছনে আছে এক মহাপুরুষের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অসীম ধৈর্য্য। তাঁর নাম স্বামী সচ্চিদানন্দ। তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। শাস্ত্রজ্ঞ এই সন্ন্যাসী রুদ্রপ্রয়াগের জনজীবনের সমস্ত অন্ধকার ঘোচাতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। আজকের এই সমৃদ্ধি তাঁরই কঠোর সাধনার ফল।

এবার গুপ্তকাশী। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার। উচ্চতা প্রায় ৫০০০ ফুট।

গুপ্তকাশী গাড়োয়ালের একটি উল্লেখযোগ্য সহর। ধর্মশালা, বাজার, দোকান, ডাকঘর, চিকিৎসালয় কোন কিছুর অভাব নেই।

জনবসতির মাঝখানেই গুপ্তকাশীর মন্দির। প্রধান বিগ্রহ বাবা বিশ্বেশ্বর।

এই মন্দিরের পাশেই গিরিরাজ দুহিতা পার্বতীর মন্দির।

সম্মুখে মণিকর্ণিকার কুণ্ড। প্রবাদ আছে এই কুণ্ডে নাকি গঙ্গা যমুনার ধারা এসে মিলিত হয়েছে।

এস্থানের নামকরণের সঙ্গেও একটা প্রবাদ জড়িত আছে।

দেবতারা এ স্থানে গুপ্ত থেকে নাকি কেদারনাথের তপস্যা করেছিলেন। তাই দেবস্মৃতি জড়িত এ স্থানের নাম গুপ্তকাশী।

এখানকার মন্দিরের পূজারী দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ। সমগ্র গাড়োয়ালের দেবমন্দিরের কর্তৃত্ব রাওয়ালের হাতে। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই দক্ষিণ ভারতের জঙ্গম বা লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। এঁদের আদিগুরু ছিলেন আচার্য্য বাসব। এঁরা সকলেই শিবের উপাসক।

গুপ্তকাশীর অদূরে যে পাহাড়টি দাঁড়িয়ে আছে সেটাই হচ্ছে উখিমঠ। মাত্র তিনমাইলের ব্যবধান, অথচ এই ব্যবধানকে অনন্ত করে রেখেছে নদী। যেটা গুপ্তকাশীর অন্ততঃ হাজার ফুট নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

অবশ্য আজকাল ঘুরপথে গুপ্তকাশী থেকে উখিমঠ যাবার রাস্তা হয়েছে। বাসও চলাচল করে।

গুপ্তকাশী বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ মেয়ে বলে উঠল—দেখ মা, সেবারে ঐ পাথরটার উপর ঠাকুরমাকে নিয়ে আমরা বসেছিলাম, তাই না? আর সেই লোকগুলো—। বারে বারে ঠাকুরমাকে দেখছিল। মেয়ের কথায় আদ্যোপান্ত মনে পড়ে গেল। মনে মনে হেসে উঠলাম—।

১৯৭০ সাল। সেবারে গাড়োয়ালে বন্যায় পথঘাটের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। তাই সেপ্টেম্বর অক্টোবরে যাত্রী সমাগম ছিল না বললেই চলে।

আমরা সেপ্টেম্বরের শেষে ডাল-তেল-নুন বোঝাই একটা বাসে চড়ে কেদারের পথে এই গুপ্তকাশী এসে নেমেছিলাম। সঙ্গে মাও ছিলেন। হাঁটবার ক্ষমতা নেই। ভেবেছিলাম গুপ্তকাশী থেকে ডাণ্ডি কাণ্ডি যাহোক একটা ব্যবস্থা করে নেব।

গুপ্তকাশী পৌঁছে দেখি একেবারে ফাঁকা। যাত্রী নেই তাই কোন ব্যবস্থাও নেই। লোকজন সব যে যার গাঁয়ে চলে গেছে।

ছোটভাই অনেক ঘুরে কয়েকজন কাণ্ডিওয়ালাকে ডেকে নিয়ে এল।

বাসষ্ট্যাণ্ডের একপাশে একখণ্ড পাথরের উপর নাতি-নাতনীকে পাশে নিয়ে মা বসে আছেন।

এক একজন কাণ্ডিওয়ালা কাছে আসছে আর মাকে দেখে নেতি-বাচক ঘাড় নেড়ে চলে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ কাছে এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখে ফিরে আসছে। একজন তো মায়ের চারদিকে ঘুরে দেখে নিল।

ব্যাপারটা কারও নজর এড়ায়নি। মায়ের শরীরটা একটু ভারী। তাই বলে এরকম করার কোন মানে হয় না। আরও কত ভারী মানুষকে আমি কাণ্ডি করে নিয়ে যেতে দেখেছি। আসল কথা মোচড় দিয়ে বেশী আদায় করার মতলব।

মা নিশ্চয় লজ্জা পাচ্ছেন। এতে আমরা সকলেই একটা অস্বস্তি বোধ করছি। ছেলেমেয়ে ছুটো গভীর আগ্রহে সব কিছু লক্ষ্য করছে। ভবিষ্যতে এ ঘটনাকে তারা যে বিচিত্র ভঙ্গীতে নাট্যরূপ দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অবশেষে চড়া দর কবুল করে ব্যবস্থা করলাম।

কাটা—রামপুর—শোন প্রয়াগ

ত্রিযুগী নারায়ণ

॥ ৪ ॥

গুপ্তকাশী ছেড়ে দু'কিলোমিটার এগুলেই নালাচটি, তারও কিছুদূর পরে জুরানি। এখান থেকেই কালীমঠ যাবার রাস্তা। ডান দিকে নেমে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথ। এ পথের বর্ণনায় পরে আসছি।

বাস এসে কাটাচটিতে দাঁড়াল। উচ্চতা প্রায় ৫৫০০ ফুট। মনোরম জায়গা। সবরকম সুবিধাও বর্তমান। দোকানপাট, হাসপাতাল, পোষ্ট-অফিস, ধর্মশালা এবং থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত।

এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনকে নাড়া দেয়। চারিদিকে সবুজ বনানী। দূরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে তুঙ্গনাথের চূড়া।

আগেরবার এখানে দু-রাত কাটাই। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় সবুজের মাথার উপর সাদা বরফের বিচিত্র শোভা দু'চোখ ভরে দেখেছিলাম।

এখন শোনপ্রয়াগ পর্য্যন্ত বাস যাচ্ছে। সামনের বছর গৌরীকুণ্ড, তারও কয়েক বছর পর একেবারে কেদারনাথের মন্দির প্রাঙ্গণ। এতে যাত্রীদের পরিশ্রমের লাঘব হচ্ছে সন্দেহ নাই কিন্তু পথের বিভিন্ন স্থানের ধর্মমাহাত্ম্য বৈশিষ্ট্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

প্রায়ই শুনি—কেদারবদ্রী গিয়েছিলাম। মন্দির দর্শন করে আনন্দ পেয়েছি, তবে খুব ঠাণ্ডা। হৃষিকেশ থেকে যেতে আসতে ছ'দিন লেগেছে।

ভাবতেও যেন কেমন লাগে। হিমালয়ের পথের আনন্দ বাদ দিয়ে শুধু মন্দিরের দেবতা দর্শনে কতটুকু আনন্দ। কতটুকু তৃপ্তি হতে পারে।

ফাটার পরেই রামপুর চটি। অনেক বাড়ীঘর, দোকান, ধর্মশালা। এককালে রামপুর এপথের প্রাণকেন্দ্র ছিল। ডাণ্ডি, কাণ্ডি, কুলী, ঘোড়া সবকিছু সংগ্রহ করা যেত। তাই লোকজনের ভীড়ও ছিল। এখন একেবারে ফাঁকা।

শোনপ্রয়াগ রামপুরের জায়গা দখল করে নিয়েছে। এখন কেদারের পথে শোনপ্রয়াগ থেকে হাঁটাপথের স্থুরু। তাই যাত্রীরা সেখানে গিয়েই সব ব্যবস্থা করে নেন।

ছু'একবছরের মধ্যে গৌরীকুণ্ড শোনপ্রয়াগের জায়গা দখল করে নেবে।

ভেবেছিলাম পঞ্চকেদার পরিক্রমার জন্য লোকজন যোগাড় করে রামপুর থেকেই পদযাত্রা শুরু করব। কেননা ত্রিযুগীনারায়ণ যেতে হলে সীতাপুর হয়ে যাওয়াই প্রশস্ত।

রামপুর থেকে প্রায় ছু'কিলোমিটার দূরে সীতাপুর চটি, ছু'চারটে দোকানঘর, থাকা-খাওয়ার স্থবিধা আছে।

আগে অনেকে এখানে রাত কাটিয়ে সকালে ত্রিযুগীনারায়ণ যাত্রা করতেন। আবার ফেরার সময় কেদারের পথে শোনপ্রয়াগে নেমে আসতেন। আগে আমরাও তাই করেছিলাম।

এখন আর এ পথে বিশেষ কেউ ত্রিযুগীনারায়ণ যান না। বাসে একেবারে শোনপ্রয়াগ।

আমাদেরও বাধ্য হয়ে শোনপ্রয়াগ চলে যেতে হ'ল। কেননা লোকজন যোগাড় করতে হবে।

শোনপ্রয়াগ, শোনগঙ্গা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল। শোনগঙ্গার জন্ম বাস্থকীতাল থেকে। তাই অপর নাম বাস্থকিগঙ্গা।

আগেরবার এখানে মাত্র ছু'একটি চায়ের দোকান দেখেছিলাম।

বর্তমানে বহু ঘরবাড়ী, দোকানপাট। বেশ কয়েকটা সরকারী অফিসও হয়েছে।

এখন এখানে একসঙ্গে বহুলোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে। মাল বইবার প্রচুর লোক এখানে এসে জড় হয়েছে। তাদের একটা এ্যাসোসিয়েশানও আছে।

ডাণ্ডি কাণ্ডি ঘোড়া কোনটারই অভাব নেই।

এখান থেকেই আমাদের হাঁটাপথের সুরু। কুলি নিতে হবে। অন্ততঃ দু'জন।

সমস্যা দাঁড়াল—পঞ্চকেদারের পথঘাট জানা এমন কুলি পাওয়া নিয়ে। অবশেষে যোগাড় হ'ল। ধনবাহাদুর আর মনবাহাদুর। ৫/৬ বছর আগে ধনবাহাদুর যাত্রী নিয়ে পঞ্চকেদার ঘুরে এসেছে। ভরসা পেলাম।

৩০শে সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ছ'টায় ত্রিযুগীনারায়ণের পথে যাত্রা সুরু করলাম।

শোনপ্রয়াগ থেকে কেদারের পথে খানিক এগুলেই একটা কাঠের ফলক চোখে পড়ে। ত্রিযুগী যাবার পথ নির্দেশ। রাস্তার বাঁদিকে, চড়াই পথে।

শোনপ্রয়াগ থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার চড়াই ভেঙ্গে শাকম্ভরী দেবীর মন্দিরে পৌঁছলাম।

প্রবাদ আছে অনাবৃষ্টির ফলে পৃথিবী শস্যহীন হয়ে পড়ে। দেবী নিজের দেহ থেকে শাক উৎপন্ন করে জীবের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।

পূজারীর মুখে শুনলাম দেবীকে একখণ্ড বস্ত্রদান বিধেয়।

এখান থেকে দু'কিলোমিটার দূরে ত্রিযুগীনারায়ণ। উচ্চতা ৬০০০ ফুটের কিছু বেশী।

অতি মনোরম জায়গা, দূরে শুভ্র গিরিশৃঙ্গ। দোকানপাট, পাণ্ডাদের বাড়ী, ধর্মশালা সব আছে।

শুধু ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে যাত্রীদের আগমন। আজকাল যাত্রীরা

শোনপ্রয়াগ থেকে সোজা কেদারনাথ দর্শনে চলে যান। হিমালয় প্রেমিক ছাড়া এদিকে বড় একটা কেউ আসেন না।

কেদারের পথে বাস যত এগুবে ত্রিযুগীনারায়ণ ততই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে।

ত্রিযুগীনারায়ণ থেকে পাওয়ালির চড়াই অতিক্রম করে গঙ্গোত্রী যাওয়া যায়। অবশ্য সে পথ সাধারণ যাত্রীদের জন্য নয়।

ত্রিযুগী হচ্ছেন নারায়ণ। এখানে তিনযুগ ধরে তাঁর স্থিতি।

মন্দিরের ভিতর নানা দেবদেবীর মূর্তি। মন্দির চত্বরে শীতল-জলের কুণ্ড। তাতে স্নান সেরে মন্দিরে পূজা দিলাম।

এখানে শিবপার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। নারায়ণ সাক্ষী, বিবাহ যজ্ঞের হোমাগ্নি-শিখা আজও অনির্বাণ।

যাত্রীরাও কাঠ দিয়ে ঐ অগ্নিতে আহুতি দেন। আত্মীয় পরিজনদের জন্য যজ্ঞকুণ্ডের পবিত্র ছাই নিয়ে আসেন।

আগের বারে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া ছাই এবার যাত্রাক্ষণে মা আমাদের মাথায় ছিটিয়ে দিয়েছেন।

খাওয়া দাওয়া সেরে বেলা ১টা নাগাদ কেদারের পথে রওনা দিলাম।

গৌরীকুণ্ড—রামওয়াড়া

কেদারনাথ

॥ ৫ ॥

ত্রিযুগীনারায়ণ থেকে উতরাই পথে কেদারের রাস্তায় এসে পড়লাম। এখন শুধু চড়াই। ছায়া ঘেরা পথ। ঝিরঝিরে হাওয়া।

মহানন্দে পথ চলি।

দু'কিলোমিটার এগিয়ে মুণ্ডকাটা গণেশের মন্দির। আরও প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার এগুলে গৌরীকুণ্ড।

উচ্চতা প্রায় ৬৫০০ ফুট। বেশ বড় চটি। দোকানপাট ঘরবাড়ি সব আছে।

যাত্রীরা এখানে গরমজলের কুণ্ডে স্নান করে ক্লান্তি দূর করেন।

কুণ্ডের পাশেই গৌরীদেবীর মন্দির। মন্দিরের পাশে বয়ে চলেছে মন্দাকিনীর হিমশীতল ধারা।

বিকাল পাঁচটা নাগাদ আমরা এখানে এসে পৌঁছলাম। আজকের মত পথচলা এখানেই শেষ।

পরের দিন সকাল হতেই আবার চড়াই পথে এগিয়ে চলি, চড়াই হলেও ছায়াশীতল। দু'দণ্ড বিশ্রাম নিলে আবার স্বাভাবিক শক্তি ফিরে আসে।

গৌরীকুণ্ড ছাড়িয়ে সবে মাইলখানেক এসেছি। পেছন থেকে নাম ধরে কে যেন ডাকছে। ফিরে দেখি প্রিয় সুহৃদ সুশীল দে। সঙ্গে আরও দুই বন্ধু। তারাপদ রায়চৌধুরী আর সোমনাথ লাহিড়ী। তিনজনই ঘোড়ার পিঠে চলেছে।

সুশীলদা হিমালয়ে প্রায়ই আসে, বিশেষতঃ কেদারে। কাছাকাছি হতেই বললে—শরীর আর কুলাইল না। তাই বাধ্য হইয়া ঘোড়া

করলাম। এ্যাগো দু'জনের অবস্থাও তাই। তোমাগো মত হাঁইট্যা যাইতে পারলে আনন্দ হইত। কিন্তু করুম কি, ক্ষমতায় কুলাইল না। তবে ঘোড়ার পিটে চইড়াও সুখ নাই। পাছায় ভয়ানক লাগে। কুচকিতেও ব্যথা।

ওরা তিনজন এগিয়ে যায়।

আমি পেছন থেকে বলি,—যেন ওদের সঙ্গে আমাদেরও আস্তানা ঠিক করে রাখে।

গৌরীকুণ্ড থেকে দু'মাইল এগুলে জঙ্গলচটি। ক্ষণিক বিশ্রামের জায়গা, চা-দুধ-জিলাপী-পকৌড়া সবই মিলে।

আরও দু'মাইল এগিয়ে রামওয়াড়া। উচ্চতা প্রায় ৮০০০' ফুট। ধর্মশালা, দোকানপাট, সরকারী ডাক্তারখানা সব আছে।

মন্দাকিনীর হিমশীতল ধারা বয়ে চলেছে, দূরে সাদা বরফের পাহাড়। ভীষণ শীত।

সেবার এখানে রাত কাটাই। সঙ্গে মা ছিলেন, হার্টের রুগী। কেদারের ১১৭৫০ ফুট উঁচুতে রাত কাটাতে ভরসা হয় নি। তাই ভোরে এখান থেকে বেরিয়ে কেদারনাথের পূজা সেরে আবার এখানে এসে রাত কাটিয়েছি। অনেক যাত্রীই এরকম করে থাকেন।

রামওয়াড়া থেকে কেদার আগে ছিল তিন মাইল। এখন হয়েছে পাঁচ মাইল। দু'মাইল রাস্তা বাড়ার দরুণ চড়াই খানিকটা কমেছে। তিন মাইলে সাড়ে তিন হাজার ফুট উঠতে হ'ত। এখন সেটা পাঁচ মাইলে উঠতে হবে।

রামওয়াড়া ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি, সবুজের সমারোহ আস্তে আস্তে কমে আসছে, ছোট ছোট বুনোগাছের ঝোপ। নানারঙের শিলাস্তর। মন্দাকিনীর কলধ্বনি যেন পথের সাথী।

লাঠিতে ভর দিয়ে ক্লান্ত শরীর টেনে চলি। শ্বাসের গতি দ্রুত হয়। একটু দাঁড়িয়ে আবার চলি।

অবশেষে গরুড় চটি। ১১০০০ ফুট।

কেদারনাথের চড়াই মোটামুটি এখানেই শেষ। এখান থেকে কেদারের রাস্তা প্রায় সমান্তরাল।

খানিকদূর এগুতেই যতীনদা—'কেদারনাথজী কি জয়' বলে চীৎকার করে ওঠেন।

তাকিয়ে দেখি—অদূরে কেদারনাথের মন্দির দেখা যাচ্ছে। এ স্থানের নাম দেব-দেখনি।

তুষারশুভ্র হিমালয়ের নীচে বিস্তীর্ণ উপত্যকার প্রান্তে ভগবান কেদারনাথের মন্দির। যেন মন্দিরের চূড়ায় বিশাল এক রূপোর বটবৃক্ষ বিরাট শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছত্রাকারে দাঁড়িয়ে আছে।

মুহূর্তে পথের ক্লান্তি মুছে যায়। আনন্দে বিস্ময়ে দেহমন নেচে ওঠে। এগিয়ে চলি।

মন্দাকিনীর পুল পেরুলেই অন্নপূর্ণার মন্দির, পাশেই স্নানের ঘাট। সারি সারি ঘরবাড়ী।

অবশেষে কেদারনাথের মন্দির। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে মন্দির চত্বরে উঠে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করি।

সুশীলদা কথা রেখেছে। নিজেদের পাশের ঘরেই আমাদের ব্যবস্থা করেছে।

কেদারনাথ। উচ্চতা ১১৭৫৩ ফুট। ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ দেবালয়।

মন্দিরের দ্বারদেশে নাদেশ্বর (মহাদেবের ষাঁড়)। প্রবেশপথে গণেশের মূর্তি।

প্রধান ফটক পেরুলে দেওয়াল গাত্রে দ্রৌপদী কুন্তীসহ পঞ্চ-পাণ্ডবের মূর্তি। আর একটু এগুলে বাঁদিকে লক্ষ্মীদেবী। ডানদিকে পার্বতী।

মন্দিরের শেষ অংশে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম শ্রীশ্রীকেদার নাথের বিশাল লিঙ্গমূর্তি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবগণ স্বজন হত্যায় মর্মান্তিক ব্যথা পান, পাপ-

মুক্তির আশায় তীর্থযাত্রা করেন। অবশেষে মহেশ্বরের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় হিমালয়ের এই কেদারভূমিতে আসেন।

কিন্তু মহাদেব দর্শন দিতে অনিচ্ছুক। তাই মহিষের ছদ্মবেশে তিনি ভূগর্ভে আত্মগোপনের চেষ্টা করেন।

কিন্তু প্রবল পরাক্রম ভীমসেন তাঁকে জাপটিয়ে ধরে ফেলেন। তাতে পশ্চাদ্‌ভাগ পাষাণরূপে ভূমির উপরে থেকে যায়।

এখানেই পাণ্ডবগণ সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করে তাঁর আরাধনা করেন, পাপমুক্ত হন।

সেই মহাকাব্যের যুগ থেকে এই শিলাখণ্ড কেদার লিঙ্গরূপে খ্যাত। পঞ্চকেদারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেদার, হিমগিরির শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

শোনা যায় শঙ্করাচার্য এই মন্দিরের অনেক সংস্কার করেন; এবং এখানেই দেহরক্ষা করেন। কেদার মন্দিরের পিছনে তাঁর স্মৃতিমন্দির তৈরী হয়েছে।

এই কেদারনাথে অনেকগুলি কুণ্ড আছে। রেতস, উদক, রুদ্র, হংস, সুফল, অমৃত। প্রতিটি কুণ্ডের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য। যেমন উদককুণ্ডের জলপানে মোক্ষলাভ। হংসকুণ্ডে শান্তি সস্ত্যয়নে পুণ্যসঞ্চয়, ইত্যাদি।

মে জুন মাসে এখানে প্রচুর তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। তখনও শীতের বরফ বেশ কিছু জমে থাকে। তবে মনোরম আবহাওয়া সেপ্টেম্বর অক্টোবরেই পাওয়া যায়।

আজকাল কেদারে শহরের স্বাচ্ছন্দ্য। ঘরবাড়ী, দোকানপাট, ধর্মশালা, পোষ্টঅফিস, হাসপাতাল কত কি?

হাঁটাপথও ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। হয়ত কয়েক বছরের মধ্যে মন্দির চত্বরে বাস চলে যাবে।

তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের কোলে কেদারনাথের মন্দির। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

মন্দিরের পিছনে সাদা বরফের পাহাড় ধরে খানিকটা এগুলে ডানদিকে যেটা গিরিপথের মত মনে হয়, সেটাই নাকি মহাপ্রস্থানের পথ।

এককালে কেদার থেকে তুষার গিরিশিখরের উপর দিয়ে নাকি বদ্রীনারায়ণ যাওয়া যেত। শোনা যায় একই পূজারী প্রত্যহ এইপথে হেঁটে কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণের পূজা করতেন। তাঁর এক ত্রুটির ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সেপথ আজ অগম্য।

কেদার মন্দিরের পূর্বদিকে পাহাড়ের গায়ে ভৈরবনাথের মন্দির।

উপরে বরফের পাহাড় থেকে মিলিত ধারা মন্দাকিনী হয়ে নেমে আসে। কেদারবন্দনা সেরে কলরবে ছুটে চলে রুদ্রপ্রয়াগের পথে। মিশে যায় অলকানন্দার সাথে।

মন্দাকিনীর উৎস চোরাবালি তাল। পর্বত উপত্যকার একটা হ্রদ।

মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম এখানেও বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। তাই বর্তমান নাম গান্ধীসরোবর।

এপথে আরও খানিকটা চড়াই ভেঙ্গে উতরাই এর মুখে বাসুকি-তাল। চোরাবালিতালের মতই একটা হ্রদ। বাসুকিতাল থেকে যে জলধারা নেমে এসেছে তার নাম বাসুকিগঙ্গা বা শোনগঙ্গা। শোন প্রয়াগে মন্দাকিনীর সঙ্গে মিশেছে।

হিমালয় দেবালয়। গিরিশৃঙ্গ থেকে নেমে এসেছে অসংখ্য কল্লোলিনী। তারই তটে গড়ে উঠেছে অজস্র মন্দির। কি বিচিত্র প্রাকৃতিক শোভা। গ্রহ-তারা-নক্ষত্র খচিত রত্নালঙ্কারে চারিদিক জ্যোতির্ময়। তারই মাঝে উজ্জ্বলতর জ্যোর্তিলিঙ্গ এই কেদারনাথ।

স্বর্গলোক। যুগ যুগ ধরে মানবচিত্ত তৃষ্ণা নিয়ে ছুটে আসে। রূপের তৃষ্ণা। অরূপের তৃষ্ণা। অঞ্জলি ভরে পান করে ঈপ্সিত সুধা।

পূজারীর বেদমন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রীতে যোগায় সুরমূর্চ্ছনা। দেহমনে রোমাঞ্চকর শিহরণ। অপার আনন্দ। অখণ্ড শান্তি।

শিক্ষা, সভ্যতা, যুগধর্মের ধ্যান ধারণা স্থান মাহাত্ম্যে একাকার।

নিরন্তর যাত্রীপ্রবাহ চলে। অঞ্জলিবদ্ধ করপুট। যেন শতসহস্র প্রস্ফুটিত ব্রহ্মকমল। অন্তরে প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা। অবশেষে দেবতার চরণে নতশিরে আত্মনিবেদন। আত্মসমর্পণ। আত্মাহুতি। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

জুরানি—কালীমঠ—লেক্—রাঁশী

॥ ৬ ॥

কেদার থেকে একই দিনে শোনপ্রয়াগ ফিরে এলাম। উতরাই এর পথ। তুলনায় কষ্ট কম। তবে হাঁটুর মালাইচাকি ব্যথায় টনটন করে। চড়াই পথে ব্যথাটা হয় পায়ের গোড়ালীতে।

এবার মদ্‌মহেশ্বর। মধ্যম কেদার। হিমালয়ের অন্যতম জাগ্রত দেবতা।

এই অংশের প্রতিটি বাসিন্দার কাছে মদ্‌মহেশ্বরের প্রভাব অপরিসীম। রক্ষাকর্তা। পালনকর্তা। ভগবান।

শোক-তাপ-দুঃখ হরণ করেন। আপদে বিপদে ত্রাণ। সমস্যায় সমাধান। এক কথাই ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু। এই জাগ্রত দেবতার অসীম ক্ষমতা। অনেক গল্প অনেক উপকথা পাহাড়ীদের কাছে শোনা যায়।

শোনপ্রয়াগ থেকে ভোর ছ'টায় একটা বাস ছাড়ে। গুপ্তকাশী উখীমঠ হয়ে মস্তুরা পর্য্যন্ত যায়।

আমরা ঐ বাসে করে জুরানি এসে নামলাম। ফাটাচটি এবং গুপ্তকাশীর মাঝখানে এই জুরানি। এখানে 'বাসরাস্তার' উপর কোন দোকানপাট নেই।

মদ্‌মহেশ্বরের পথে এখান থেকেই-হাঁটাপথের সুরু। রাস্তা বলে কিছু নেই। বাঁদিকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা পথের রেখা এঁকে বেঁকে নীচে নেমে গেছে। যেখানে মন্দাকিনী পেরুতে হবে।

মাঝে মাঝে জঙ্গল বেশ ঘন। দিনের বেলায়ও অন্ধকার।

পথের মাঝে বেশকিছু তেজপাতা গাছ দেখলাম। শুকনো পাতা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে।

উতরাই পথে মন্দাকিনীর পুল পর্য্যন্ত চলে এলাম। আবার চড়াই আরম্ভ। কালীমঠ পর্য্যন্ত প্রায় সবটাই চড়াই।

আমাদের উপস্থিত গন্তব্যস্থল কালীমঠ। দুপুরের আগে পৌঁছতে হবে।

বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ কালীমঠ পৌঁছে গেলাম।

কালীমঠ। উচ্চতা প্রায় ৪০০০ ফুট। কালীগঙ্গার তীরে মহাকালীর মন্দির। চটি ধর্মশালা, স্কুল, পোষ্টঅফিস সব আছে। আশে পাশে বেশ কয়েকটা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামের লোকেদের কাছে এই মন্দির জাগ্রত পীঠস্থান।

এখানে কালী, সরস্বতী এবং লক্ষ্মীর মন্দির আছে। মন্দির সংলগ্ন নদীর ধারে একখণ্ড বিরাট পাথর। নাম দৈত্যশিলা।

কালীমঠে মহাকালীর মন্দিরটি চারিপাশ খোলা। মাঝখানে একটা সুড়ঙ্গ। মুখে একটা পাথর। তার উপর মহাকালীর পূজা হয়।

দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর রাত্রি এবং নবমীর দিনে এখানে বিশেষ উৎসব পালিত হয়। প্রচুর বলিদান হয়। মেলাও বসে। ঐ সময় এখানে প্রচুর জনসমাগম ঘটে।

মঠাধীশ শ্রী নারায়ণ সিং রাণা। অতি সজ্জন ব্যক্তি। যাত্রীদের সুখ সুবিধার দিকে তাঁর বিশেষ নজর। তিনি একাধারে পোষ্টমাষ্টার, মঠ এবং মঠের সম্পত্তির দেখাশুনার ভারপ্রাপ্ত।

শ্রীতুলসীরাম; শ্রীকৃষ্ণ, বাচ্চিরাম, মায়ারাম এবং চৈৎরাম ভাট্ প্রত্যেকেই কালীমঠের পূজারী। সুপণ্ডিতও।

কালীমঠ থেকে বেশ খানিকটা চড়াই পথে দেওকিগ্রাম পেরিয়ে কালীশিলা। বিরাট এক পাথরের চাতাল।

প্রবাদ আছে শুম্ভ নিশুম্ভ দুই মহাদৈত্যের অত্যাচারে

অভিষ্ঠ হয়ে দেবতারা এই শিলায় বসে জগন্মাতার আরাধনা করেন।

এখানে দোকানপাট ঘরবাড়ী কিছু নেই। রাত্রিবাস কষ্টকর। কালীশিলা হয়ে মদ্‌মহেশ্বরের পথে রাঁশীগ্রামে নেমে যাওয়া যায়। অনেকেই আবার কালীমঠে ফিরে এসে লেঙ্ক হয়ে রাঁশী পৌঁছান।

আমরা সকলে কালীগঙ্গায় স্নান সেরে নিলাম।

চটিওয়ালা জয়সিং পরম সমাদরে ভাত ডাল তরকারী পাঁপড় পরিবেশন করলেন।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর যাত্রা সুরু। কালীমঠ ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব মনোরম। নদী, পাহাড়, মন্দির শস্যক্ষেত ঘরবাড়ি সব মিলিয়ে এক অপূর্ব পরিবেশ। ভবিষ্যতে এখানে এসে কয়েকদিন থাকব, এই ইচ্ছা নিয়ে এগিয়ে চললাম।

কালীগঙ্গার কলধ্বনি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা লেঙ্কের দিকে এগুচ্ছি। আর কালীগঙ্গা বয়ে চলেছে গুপ্তকাশীর দিকে। সেখানে মন্দাকিনীর সঙ্গে মিশেছে।

কালীমঠ থেকে প্রথমে খানিকটা চড়াই। তারপর কখনও চড়াই কখনও উৎরাই।

বিকাল চারটা নাগাদ মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সঙ্গে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়া।

এখনও এক মাইল পথ গেলে তবে লেঙ্ক। তার আগে কোথাও ঠাঁই মিলবে না। অতএব শত দুর্যোগেও চলতে হবে। ঝড় জলে হিমালয়ের পথ চলা সত্যিই কষ্টকর।

আমরা ক্রমশঃ একজন আর একজনের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। ছেলেমেয়ে দুটোকেও দেখা যাচ্ছে না। তার উপর বৃষ্টির সঙ্গে মুহুর্মুহু মেঘগর্জন পরিবেশটাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। যথাসম্ভব দ্রুত এগিয়ে চলি।

দূরে কয়েকটা ঘরবাড়ী দেখা যাচ্ছে। ভরসা পেলাম। লক্ষ্যস্থলে

বোধ হয় এসে গেছি। ঐতো মেয়েটা আগে আগেই চলেছে। ছেলেটা বোধ হয় মার সঙ্গে পিছিয়ে পড়েছে। আর বুড়োটা? আর ভাবতে পারছি না।

পাঁচটা নাগাদ বাপমেয়ে লেঙ্ক পৌঁছে গেলাম। সাথীসহ বাকী তিনজন ২০ মিঃ বিলম্বে পৌঁছল। সকলে ভিজে গোবর হয়ে গেছি। এই দুর্য্যোগের মধ্যে সকলে নিরাপদে যে পৌঁছতে পেরেছি এটাই আনন্দের কথা।

চটিওয়ালা গঙ্গা সিং এর অন্তরে কিন্তু অনন্ত বিশ্বাস। বলেন— আপনারা ভগবান দর্শনে চলেছেন, আপনাদের বিপদ হতেই পারে না। আমরা সকলে মদ্‌মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই।

গঙ্গা সিং এর পাশে শোভন সিং এর দোকান। গরম দুধ চা বিস্কুট সব পাওয়া যায়। দোকান সংলগ্ন একটা ঘরে রাত্রের মত আশ্রয় নিলাম।

রাস্তা থেকে উপরে আরও অনেক ঘরবাড়ী আছে। মোটকথা এখানে থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধা নেই।

এখানকার জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষক বাচ্চিরাম স্যামুয়ালের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সরল শান্ত মানুষটা। প্রয়োজনে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে গেলেন।

আটটার মধ্যে গঙ্গা সিং এর খাবার তৈরী। রুটি তরকারি গরম দুধ। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে যে যার বিছানায় আশ্রয় নিলাম।

সকাল ৭টায় আবার যাত্রা সুরু। বেরুতে একটু দেরী হয়ে গেল। কারণ কিছু মালপত্র আলাদা করে এখানে রেখে গেলাম। এই পথেই যখন ফিরতে হবে তখন বাড়তি বোঝা বয়ে লাভ কি! বেচারা সাথীরা একটু আরাম পাবে। তাছাড়া মদ্‌মহেশ্বরের চড়াই পথে বাড়তি জলের বোঝা ও তাদের ঘাড়ে চাপবে।

রাঁশীগ্রামের দিকে এগিয়ে চললাম, মাইল তিনেকের পথ।

একটা ব্যাপার ভুলেই গিয়েছিলাম। মদ্‌মহেশ্বরের পথের জন্য খাবার যোগাড় করে নিতে হবে। পথে কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না।

স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম কিছুদূর এগিয়ে একটা দোকান আছে। সেটাই এ এলাকার একমাত্র দোকান যেখানে চালডাল আটা আলু নুন চিনি চা পাওয়া যেতে পারে।

সরকারী রেশন সপ্‌ বলতেও ওটা। মালিকের নাম বাদল সিং। দোকানে চাল ডাল পাওয়া গেল না। কিছু আটা আলু আর চিনি নিলাম।

দুপুরের আগেই রাঁশীগ্রামে পৌঁছে গেলাম। এখানেই রাকেশ্বরী দেবীর মন্দির। এ স্থানের উচ্চতা প্রায় ৬৫০০ ফুট।

সকলে মন্দির চত্বরে উঠে এলাম।

রাকেশ্বরী দেবী। নামের মিল বজায় রেখে গ্রামের নাম ও রাঁশীগ্রাম।

পূজারী জনানন্দ্‌ ভাট্‌। ব্যবস্থাপক এন্‌ এস্‌ ভাট। তিনি আবার মন্দির সংলগ্ন পোষ্টঅফিসের পোষ্টমাষ্টার। লেঙ্ক থেকে মদ্‌মহেশ্বরের মধ্যে এই একটামাত্র পোষ্টঅফিস।

পূজারী জনানন্দ দেবীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনালেন। চন্দ্রের কলঙ্ক অত্রিমুনির অভিশাপের ফল। চন্দ্রের কামাসক্তি এবং ইন্দ্রিয় লালসার শাস্তিস্বরূপ মুনির এই অভিশাপ।

ভয়ে অপমানে চন্দ্র এই স্থানে শিবের কঠোর তপস্যা করেন। অভিশাপ থেকে রক্ষা পান। সেই থেকে রাকা দেবী বা রাকেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা।

রাকা অর্থাৎ পূর্ণিমা বা পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ তিথি।

পূজারী আমাদের মন্দিরে নিয়ে যান। মন্দিরে প্রবেশ করলে প্রথমেই বিরাট এক ধুনি। ঠিক অনেকটা ত্রিযুগীনারায়ণের মত। অনির্বাণ। মূল বিগ্রহ রাকেশ্বরী। সঙ্গে হরপার্বতী।

মন্দিরের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রামবাসীরাই করে থাকেন।

পূজারী এবার আমাদের নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। খাবার তৈরী। ডাল ভাত সব্জী। সঙ্গে ঘরে তৈরী মাখন। সবশেষে ঘোল। ভুরি রোজ।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম দরকার।

জনানন্দ নিজের কাহিনী সুরু করেন। সংসারের হাল চাল। কিছু টাকার অভাবে বাড়ীটা সংস্কার করা যাচ্ছে না।

আমি ক'টা টাকা দিতে গেলাম। তখন বললেন—তাড়া কিসের; দিতে হয় ফিরবার সময় দেবেন। তা'ছাড়া আপনার সঙ্গে একটু দরকারী কথাও আছে। আগে মদমহেশ্বরনাথ দর্শন করে ফিরে আসুন। তারপর—।

গণ্ডার—বানতোলি-মদ্‌মহেশ্বর

॥ ৭ ॥

আমরা পুনরায় যাত্রা সুরু করার জন্য প্রস্তুত। এমন সময় চারজন যাত্রী এলেন। তাঁরা মদ্‌মহেশ্বর দর্শন করে ফিরেছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে শুনলাম।

তাঁদের দলনেতা শ্রীঅমিয়কান্তি হাজরা। হুগলীর বাসিন্দা। হিমালয় প্রেমিক। তাঁর সঙ্গীরাও দেখলাম তাই।

তাঁরা বার বার একটা বিষয়ে আমাদের সাবধান করে দিলেন। পর্যাপ্ত জল যেন সঙ্গে রাখি। ৯ কিলোমিটার খাড়া চড়াই। পথে কোথাও একফোঁটা জল নেই।

খানিকটা দমে গেলাম। দলের সকলের বয়স আর সামর্থ্য আর একবার মনে মনে যাচাই করে নিলাম।

সাথী ধনবাহাদুর আর মনবাহাদুর আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারে। সাহস যুগিয়ে বলে—ভয় কি বাবু। আমরা তো আছি। দরকার হয় কাঁধে করে পৌঁছে দেব।

ঠিক আছে—। সব মদ্‌মহেশ্বরের ইচ্ছা।

—জয় বাবা মদ্‌মহেশ্বর। সবাই এগিয়ে চলি।

রাঁশীগ্রাম ছেড়ে খানিকটা এগুলে একটানা বেশ কিছুদূর উত্তরাই। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছায়াঘেরা পথরেখা।

বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ গৌণার বা গণ্ডার গ্রামে পৌঁছে গেলাম।

মদ্‌মহেশ্বরের পথে শেষ গ্রাম। রাস্তার ডান দিকে বেশ কয়েকটা বাড়ী নিয়ে এই গ্রাম। স্কুল ও পঞ্চায়েত্‌ ঘর আছে। যাত্রীরা সাধারণতঃ সেখানেই রাত কাটান। সকালে মদ্‌মহেশ্বর যাত্রা করেন।

এখানে এসে শুনলাম স্কুল ছুটি। পণ্ডিতজী উখীমঠ চলে গেছেন। তবে রাত্রিবাসের কোন অসুবিধা হবে না। অবশ্য ইচ্ছা করলে আর একটু এগিয়ে বাণতোলিতেও রাত কাটান যায়।

যাই হোক এগিয়ে যাওয়াই মনস্থ করলাম। মাত্র এক কিলো-মিটার পথ। বড়জোর মিনিট পনের কুড়ি লাগবে।

সন্ধ্যার মুখে বাণতোলি পৌঁছে গেলাম।

ভুল। মস্ত বড় ভুল করেছি এগিয়ে এসে। বাণতোলির একজন মাত্র বাসিন্দা। তুলারাম। চেহারা দেখে বয়স আন্দাজ করতে পারলাম না। পঞ্চাশও হতে পারে পঁচাত্তরও হতে পারে। কাঁচা-পাকা চুলদাড়ি। একখানা কম্বল বুকে পিঠে কোমরে জড়ানো।

গোটা দুই ভাঙ্গা ঝুপড়ি। একটার মধ্যে পনের কুড়িটা ছাগল ভেড়া। আর একটার একপাশে পঁাচ সাতটা গাই বাছুর, অন্যপাশে সস্ত্রীক তুলারামের সংসার ও বাসস্থান। মাঝখানে চারদিক খোলা একটা নীচু চালা। কাঠ-কুটো থাকে, রান্নাবান্নাও হয় পাশে নিজের গড়া ছোট্ট একটা শিবমন্দির।

আমরা রাতের অতিথি শুনে তুলারাম অবাক হয়। একজন দু'জন নয়। দলে আমরা সাতজন।

তুলারাম অকপটে বলে—বাবু আপনারা গণ্ডার ফিরে যান। আমার এখানে জায়গা হবে না। দেখতে তো পাচ্ছেন,—দু'খানা মাত্র ভাঙ্গা ঝুপড়ি তাও খালি নেই।

সত্যিই তো, এখানে থাকব কোথায়? তবে কি গণ্ডারে ফিরে যেতে হবে? এদিকে অন্ধকারও হয়ে এসেছে।

ফিরে যেতে কেউ রাজী নয়। সারারাত বসে কাটাব সেও স্বীকার।

অবশেষে আমাদের প্রবল ইচ্ছাই জয়ী হ'ল। ঠিক হল,— খোলা চালার নীচে সস্ত্রীক তুলারাম আর আমাদের দুই বাহাদুর থাকবে।

ঝুপড়ির মধ্য থেকে তুলারাম তাদের যৎকিঞ্চিৎ বিছানা বার করে নিয়ে এল। আমরা পাঁচজন সে স্থান দখল করে নিলাম।

বলাবাহুল্য সারারাত একদণ্ড ঘুমোতে পারিনি। বিশেষ করে পিশুপোকার উপদ্রবে।

বাণতোলি। চৌখাম্বা থেকে নেমে আসা দুই নদীর সঙ্গম স্থল। এখান থেকে প্রকৃতপক্ষে মদ্‌মহেশ্বরের বিখ্যাত চড়াই সুরু।

প্লাষ্টিকের পাত্র দুটি জল ভর্তি করে নিলাম। তুলারাম গাছ থেকে বড় একটা শসাফল এনে দিল। যাকে ওরা কাঁকড়ি বলে।

সাথীরা একটা বড় কাজ রাতেই সেরে রেখেছে। মদ্‌মহেশ্বরের পথে দুপুরের খাবার। খান কয়েক পরটা আর একটু সবজি। ঝাল নুন তো আছেই। নুনের সঙ্গে আদা আর কাঁচালঙ্কা বাটার সংমিশ্রণ। লেবু কিংবা ঐ কাঁকড়ির সঙ্গে খেতে বেশ লাগে।

পঞ্চকেদারের পথে যেখানেই সম্ভব হয়েছে কাঁকড়ি সঙ্গে রেখেছি। এতে ক্ষুধা তৃষ্ণা দুইই নিবারণ হয়।

সকাল হতেই এগিয়ে চলি। মাইল বিজ্ঞাপক ফলকে লেখা বাণতোলি থেকে মদ্‌মহেশ্বর ৯ কিলোমিটার।

হিসাব করে দেখলাম প্রায় ৬০০০ ফুট উঠতে হবে।

চড়াই হলেও পথ মোটেই দুর্গম নয়। সরকারী তদারকিতে রাস্তা মোটামুটি ভাল। খানিকটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছায়াশীতল

পথ। তারপর বেশ খানিকটা ন্যাড়া পাহাড়। তখনই কষ্টটা বেশী হয়। একে প্রচণ্ড রোদ, তার উপর দুরূহ চড়াই।

দম যেন ফুরিয়ে আসে। কিন্তু ক্ষণিকের বিশ্রাম সমস্ত ক্লান্তি হরণ করে নেয়। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়। হিমালয়ের বাতাস যেন শ্রান্তিহরা। পরম উৎসাহে এগিয়ে চলি।

অনেকখানি উঠে এসেছি। একি? দূরত্ব নির্দেশক ফলকের হিসাবে মাত্র তিন কিলোমিটার? এই হিসাব বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। হিমালয়ে মাইলের হিসাব বিশেষতঃ চড়াই পথে প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়। মনে হয় কোথাও যেন হিসাবে ভুল আছে।

বেলা সাড়ে এগারটা। ৬ কিলোমিটার এসেছি।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় সকলেই কাতর।

সাথীরা পাথরের চাতালের উপর পিঠের বোঝা নামায়।

দুপুরের আহারটা সেরে নিলেই হয়— বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে সকলে হাঁফ ছাড়ি।

আহার সেরে হিসাব করে জলপান করি। একে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তার উপর শুকনো খাবার। পরটা আর সবজি। তাতেও এক ঢোঁক বেশী মিলবে না।

কেবল কনিষ্ঠ আর জ্যেষ্ঠ একটু বাড়তি সুবিধা পেতে পারে। দুর্বলকে সবাই করুণার চোখে দেখে।

আর বেশীদূর নয়। পরম উৎসাহে এগিয়ে চলি। দেহের ক্লান্তি নিমেষে লোপ পায়।

মনের মধ্যে অস্থিরতা। কতক্ষণে দর্শন মিলবে।

শুনেছিলাম মদ্‌মহেশ্বর পৌছবার একটু আগে একটা শীর্ণ ঝর্ণা আছে। এই তো সেই ঝর্ণা। তাহলে তো এসেই গেছি।

সত্যিই তাই। বাঁদিকে ঘুরে খানিকটা এগুতেই চোখের সামনে

মনোরম সবুজ উপত্যকা। মাঝখানে মন্দির। তিনদিকে সবুজ গালিচা-পাতা গিরিশ্রেণী।

কোথাও শুধু তৃণাচ্ছাদন। কোথাও গাছপালার জঙ্গল। গিরি-শীর্ষে তুষারশৃঙ্গ।

চারিদিকে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। শান্ত সমাহিত ধ্যানমগ্ন মহাযোগীর প্রকৃষ্ট তপঃক্ষেত্র।

মদ্‌মহেশ্বর। মধ্য-মহেশ্বর। উচ্চতা—১১৪৭৫ ফুট। এখানে মহাদেবের নাভি প্রকাশিত।

মন্দির দেখতে অনেকটা কেদারনাথের মত। তবে আকারে একটু ছোট।

মন্দিরের অভ্যন্তরে কালো পাথরের উপর লিঙ্গমূর্তি। ঈষৎ হেলানো।

পূজারী উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। আমরা দেবতার উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দিই। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি।

পূজা শেষে মন্দির পরিক্রমা করি। মন্দির প্রাঙ্গণে এক জায়গায় পাথরের উপর চারটি গরুর খুরের চিহ্ন। ওখানে পূজাপার্বণের বিধি আছে।

মন্দিরের পাশে দুটি গুহা। প্রবাদ আছে মুনিঋষিগণ ওখানে বসে তপস্যা করতেন।

মন্দির চত্বরে আরও অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির। এখানে হরপার্বতীর বিভিন্ন ভাব ও ভঙ্গী প্রকাশিত।

পার্বতীর সুন্দর মূর্তি। রত্নালঙ্কারে ভূষিতা। মহাদেব কখনও যোগাসনে ধ্যানমগ্ন। কখনও উভয়ে বাহুবদ্ধ।

একপাশে সিদ্ধিদাতা গণেশ। এ ধরণের মূর্তি সচরাচর অন্য কোথাও চোখে পড়ে না।

পরম বিস্ময়ে মহানন্দে সময় কাটে। মন্দির কমিটির নবনির্মিত অতিথিশালায় আছি। অতি উত্তম পরিবেশ।

রাতে প্রচণ্ড শীত। মন্দির কমিটি থেকে প্রত্যেকের জন্য বাড়তি দু'খানা করে কম্বল নিলাম। তাছাড়া শোবার সময় প্রত্যেকে পর্য্যাপ্ত গরম পোশাক গায়ে চাপিয়ে নিই।

হঠাৎ বৃষ্টি নামে। গুরুগুরু মেঘ গর্জন। পাহাড়ের গায়ে ধ্বনি-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়।

তীব্র শীতে বিছানার মধ্যে আমরা কুঁকড়ে থাকি।

ভোর রাতে মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি এবং পূজারীর সুরেলা কণ্ঠের স্তোত্রপাঠ প্রভাতের সূচনা করে।

বিছানা ছেড়ে উঠি। মদ্‌মহেশ্বর উপত্যকায় ঘুরে বেড়াই।

মন্দিরের পাশেই সুউচ্চ পাহাড়। গায়ে সবুজ গালিচা পাতা।

প্রায় হাজার ফুট উঠলে বিরাট এক সমতলভূমি। একটা ছোট মন্দির। পাথর দিয়ে সাজানো। ভিতরে লিঙ্গমূর্তি। বৃদ্ধ মদ্‌মহেশ্বর।

প্রবাদ আছে পাণ্ডবেরা এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মদ্‌মহেশ্বরের দর্শনে এসে মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

এখান থেকে তুষারশুভ্র চৌখাম্বার দৃশ্য খুব সুন্দর। আর খুব কাছে বলেই মনে হয়।

মদ্‌মহেশ্বরের প্রধান পুরোহিত দক্ষিণ ভারতীয় রাওয়াল ব্রাহ্মণ। গাড়োয়ালী মেয়ে বিয়ে করে সস্ত্রীক এখানে আছেন। স্থায়ী নিবাস উখীমঠ।

পূজারী আরও একজন আছেন।

তাঁদের সাহায্যকারী একজন গাড়োয়ালী। গণ্ডার গ্রামের বাসিন্দা।

আর আছে বিশালকায় দুটি কুকুর। দেখতে অনেকটা ভল্লুকের মত। গলায় চওড়া টিনের পাত মোড়া। বন্য হিংস্র জন্তু হঠাৎ

যাতে টুঁটি কামড়ে ধরতে না পারে। এরা প্রহরীর কাজ করে।

পাহাড়ে যারা ছাগল ভেড়ার পাল নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের সঙ্গে এরকম অন্ততঃ দুটো কুকুর থাকবেই।

এবার মদ্‌মহেশ্বর থেকে নেমে আসার পালা। মন ভারী হয়ে ওঠে।

হিমালয়ের এই শান্ত নির্জন উপত্যকা মায়াজাল সৃষ্টি করে যাত্রীকে ধরে রাখতে চায়। অপরিসীম আনন্দে মন ভরিয়ে দেয়। তাই ফেরার পথে যাত্রীরা বারবার পিছু তাকায়। আবার আসার সঙ্কল্প নিয়ে ফিরে চলে।

উখীমঠ—চোপতা—তুঙ্গনাথ

॥ ৮ ॥

ফেরার পথে আবার বাণতোলি। তুলা সিং এর আস্তানায় দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা।

তারপর গণ্ডার গ্রাম।

দিনের শেষে রাঁশী। পূজারী জনানন্দ হাসিমুখে এগিয়ে আসেন। পথে কোন কষ্ট হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে গাঁয়ের একমাত্র চায়ের দোকান থেকে চা বিস্কুট আনিয়ে দেন। তিনি জানেন শহরের লোকের কাছে চা হচ্ছে ক্লান্তিহরণ মহৌষধি।

রাত্রে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও চমৎকার। জনানন্দের ঘরে। অপরিসর জায়গা। অবশ্য তেমন কোন অসুবিধা হয় না। আদর যত্নের ত্রুটি নেই।

খাওয়া শেষে জনানন্দ একটা আর্জি পেশ করলেন। দেবতার আশীর্বাদি ফুল আর একটা হাতচিঠি কর্ণেল সত্যেন্দ্রপ্রসাদ মুখার্জীকে পৌঁছে দিতে হবে। যতীনদা যে কর্ণেল সাহেবের বন্ধু সেটা আগেই জানা হয়ে গেছে।

কী ব্যাপার? কিছু অর্থ সাহায্যের আবেদন।

বাসগৃহটার সংস্কার না করলেই নয়। এতক্ষণে যাবার সময়ের সেই "দরকারী কথাটা" বুঝতে পারলাম। যাই হোক যতীনদা পৌঁছে দেবার ভার নিলেন।

বিদায়ক্ষণে জনানন্দকে ইচ্ছা থাকলেও বাড়তি তেমন কিছু দিয়ে আসতে পারিনি। মনে ক্ষোভ রয়ে গেল।

সকাল ১০টার মধ্যে লেঙ্ক পৌঁছে গেলাম। গঙ্গা সিং দুপুরের খাবার তৈরী করতে লেগে গেল। এই অবসরে আমরা বিছানাপত্র রোদে মেলে দিলাম। পিশুপোকা থাকলে নিশ্চয় পালাবে।

দোকানের লাগোয়া জলের কল আর স্নান ঘর। গায়ে সাবান মেখে সকলে স্নান করে নিলাম। কালীমঠের পর এত ভাল স্নান আর হয় নি।

দুপুর ১টা নাগাদ আবার যাত্রা সুরু। এবার উখীমঠ।

লেঙ্ক থেকে উখীমঠ যাবার দুটি রাস্তা আছে। একটি কালীমঠ, গুপ্তকাশী হয়ে। অন্যটি রাস্তা থেকে উতরাই পথে নেমে আকাশগঙ্গা নদী পেরিয়ে আবার চড়াই পথে মনসুনা গ্রাম হয়ে। আকাশ-গঙ্গাকে মদ্‌মহেশ্বর গঙ্গাও বলা হয়।

কালীমঠ গুপ্তকাশী হয়ে রাস্তা ভাল। গুপ্তকাশী থেকে বাসে উখীমঠ যাওয়া যায়। তবে এ পথটা একটু দীর্ঘ। সময়ও বেশী লাগে।

তবে আকাশগঙ্গা পেরিয়ে মনসুনা হয়ে যেতে হলে আকাশগঙ্গা পেরুবার ভাল ব্যবস্থা আছে কিনা প্রথমেই জেনে নিতে হবে। হেঁটে নদী পেরুবার ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। একে হিমশীতল জলস্রোত। তলায় আবার শেওলাধরা অজস্র পাথর। প্রতি মুহূর্তে পা ফসকে যাবার ভয়। তাই অনেকে সময় এবং দূরত্ব বেশী জেনেও গুপ্তকাশী হয়ে উখীমঠ যাওয়া শ্রেয় মনে করেন।

পাহাড়ীদের কাছে যেটা সহজ আমাদের কাছে মোটেই তা সহজ নয়।

স্থানীয় লোকের কথা শুনে আমরা অবশ্য আকাশগঙ্গার পথই বেছে নিলাম।

সাথীরা মালপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। আমাদের এগিয়ে যেতে বলল।

হঠাৎ আকাশে মেঘের ঘনঘটা। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ক্রমশঃ যেন বাড়ছে। একটা বাড়ীর চালের তলায় দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটু কমলে আবার এগুতে থাকি।

সাথীদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। বৃষ্টির মধ্যে উতরাই পথে ভয়ে ভয়ে এগুচ্ছি। পা পিছলে যাবার ভয়। কোথাও বসে পড়ে অনেক নীচে পা রাখতে হচ্ছে।

পাশের ক্ষেত থেকে একজন বলে উঠল—নামার আসল রাস্তা নাকি আমরা বাঁদিকে ফেলে এসেছি। তবে এদিকে ও গাঁয়ের লোক কচিৎ কদাচিৎ ওঠা নামা করে।

ফিরে আসব কিনা ভাবছি। ধনবাহাদুরের চীৎকার শুনতে পেলাম। সে দেখতে পেয়েছে—আমরা ভুল পথে এগিয়ে যাচ্ছি। তাই মালপত্র রেখে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে। যাই হোক, এই পথেই সে সকলকে ধরে ধরে নামিয়ে নিয়ে এল।

বিরাট উপত্যকা। শুধু বালি আর পাথর। মাঝখানে খরস্রোতা আকাশগঙ্গা বয়ে চলেছে। স্রোতের ধারা একাধিক।

যেখানে জল বেশী সেখানে স্রোতের টানও প্রবল।

সেখানে দু'তিনটা কাঠের গুড়ি বেঁধে অস্থায়ী পুল। নড়বড়ে। সকলে সাবধানে পার হলাম।

এবার বাকী দুটি স্রোতধারা হেঁটে পার হতে হবে। শীতল জল-স্রোত। তলায় স্রোতের টানে ভেসে আসা ছোট বড় অসংখ্য পাথর। জল অবশ্য হাঁটুর বেশী হবে না।

আমিই প্রথমে জলে নামলাম। পা পিছলে গেল। দুই পাথরের খাঁজে ডান-পা আটকে গেল। ব্যথাও পেলাম। অবশেষে লাঠি চেপে ধরে অতি সন্তর্পণে পেরিয়ে গেলাম।

কিন্তু বাকীরা? ধন আর মন এগিয়ে এল; বললে—কেউ একলা যাবে না, আমরা প্রত্যেককে হাত ধরে পার করে দেব। স্রোতের মুখে পা পিছ্‌লে পড়ে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। অতএব সাবধান।

তাদের সাহায্যে একে একে সকলে পার হয়ে এল। দলপতি হিসাবে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

একটা কথা বার বার মনে হতে লাগল, এ সব পথে ঐ সাথীরা কতখানি অপরিহার্য্য! একথা ঠিক মজুরী হিসাবে আমরা যা দিই, তার তুলনায় ওরা আমাদের ঢের ঢের বেশী দেয়। সামান্য অর্থের বিনিময়ে দুর্গমের পথে কত সুখ আর নিরাপত্তা। এসব অল্পে তুষ্ট নির্লোভ মানুষগুলি বর্তমান সভ্যতার বিচিত্র আলোর স্পর্শ এখনও হয়ত পায়নি। তাই যাত্রীরা ওদের সঙ্গে নিয়ে নিরাপদে পথ চলে।

নদী পার হয়ে আবার চড়াই। প্রায় ২ কিঃ মিঃ এগিয়ে মনস্থনা গ্রাম। বেশ বর্দ্ধিষ্ণু। বহুলোকের বাস। স্কুল, পোষ্টঅফিস, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র সব আছে।

আরও ২ কিঃ মিঃ দূরে ফাপাঞ্জা গ্রাম, তুলনায় ছোট।

পা চালিয়ে হাঁটি। উখীমঠ এখনও পাঁচ কিলোমিটার। অন্ধকার হবার আগেই পৌঁছতে হবে। পথ মোটেই ভাল নয়, মাঝে মাঝে বেশ খানিকটা বোল্ডারের উপর দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে।

অবশেষে সন্ধ্যায় উখীমঠ পৌঁছে গেলাম।

উখীমঠ। পুরাণ বর্ণিত বাণরাজার রাজ্য। বাণরাজার এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। উষা। সেই নামানুসারে এস্থানের নাম উষীমঠ বা উখীমঠ।

বাণরাজা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পরম শত্রু। বাণকন্যা উষা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের প্রেমে পড়ে। উষার প্রিয়সখী চিত্রলেখা এই প্রণয়লীলার প্রধান দূতী। তারই সহায়তায় উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় ঘনিষ্টতা জন্মে।

ক্রমে উষার মধ্যে মাতৃত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এ খবর বাণরাজার কানে গেল। অনিরুদ্ধ বন্দী হলেন।

অনিরুদ্ধের লাঞ্ছনার খবর শ্রীকৃষ্ণের গোচরে এলে শ্রীকৃষ্ণ সসৈন্যে বাণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

ভীষণ যুদ্ধ। অবশেষে মহাদেবের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ বন্ধে সম্মত হন। বাণরাজার প্রাণরক্ষা পায়। অনিরুদ্ধের সঙ্গে উষার মিলন ঘটে।

উখীমঠের কাছে শোণিতপুরে এখনও নাকি বাণরাজার দুর্গ-প্রাকারের ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ে।

উখীমঠের মন্দিরতোরণ এবং মন্দিরের অভ্যন্তর রাজপ্রাসাদের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। মন্দির চত্বরটাও বেশ প্রশস্ত।

মন্দিরে ওঁকারেশ্বর শিবের অধিষ্ঠান। তাছাড়া পঞ্চকেদারের পঞ্চমূর্তি। মূল মন্দিরের পাশেই রয়েছে উষা, অনিরুদ্ধ, চিত্রলেখা, গঙ্গা, মান্ধাতা এবং নবদুর্গা।

শীতকালে কেদারনাথ এবং মদ্‌মহেশ্বরের পূজা এই উখীমঠেই হয়।

উখীমঠ শহরও বটে। দোকানপাট, ঘরবাড়ী, হোটেল, ধর্মশালা, স্কুল, পোষ্টঅফিস, হাসপাতাল সবকিছু আছে। সরকারী অফিসও বিস্তর। এখান থেকে বাসে অনেক জায়গায় যাওয়া যায়।

উখীমঠ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচুতে উত্তর পূর্ব দিকে একটা হ্রদ আছে। নাম দিউরিতাল। পরিধি প্রায় সাত শ'মিটার। চারিদিকে প্রচুর গাছপালা। মনোরম পরিবেশ। এখান থেকে চৌখাম্বা, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, তুঙ্গনাথ, মদ্‌মহেশ্বর এবং আরও অনেক গিরিশৃঙ্গ পরিষ্কার দেখা যায়।

উখীমঠ মন্দিরের অনেক নীচে বাস রাস্তা। আমরা সেখানে নেমে এসে বাসষ্ট্যাণ্ডের পাশে ইন্দর সিং-এর হোটেলে আশ্রয় নিলাম। পাশে আরও একটি হোটেল আছে। মালিক শ্যাম সিং।

এখান থেকে এবার যাব তুঙ্গনাথ। চোপ্‌তা হয়ে।

উখীমঠ থেকে চোপ্‌তা সুন্দর চওড়া রাস্তা। ৩০ কিলোমিটার। কিন্তু বাস চলে মণ্ডুরা পর্য্যন্ত। তাও দিনে দু'বার।

চোপ্‌তাতে সুন্দর বাসষ্ট্যাণ্ড করা হয়েছে। কবে পর্য্যন্ত বাস চলাচল করবে কেউ বলতে পারল না। শুনলাম যাত্রীর অভাবে আপাততঃ বাস চলাচল বন্ধ।

তবে ট্যাক্সি যাতায়াত করে। ইন্দর সিং এর মধ্যস্থতায় একটা ট্যাক্সি ঠিক করা হল। আমাদের সাতজনকে চোপ্‌তা পৌঁছে দেবে। পঁচাত্তর টাকা। ঠিক হ'ল ভোর ছ'টায় ট্যাক্সি ছাড়বে।

উখীমঠ থেকে আবার যাত্রা সুরু। মন্দাকিনী ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছি। ঐ তো ওপারের পাহাড়ে মুখীমঠ। কেউ বলে মকুমঠ,— গ্রামের নাম। শীতকালে তুঙ্গনাথ দেবের পূজা ওখানেই হয়।

দ্রুত ট্যাক্সি চলে। পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ফিরে রাস্তা। একে একে পিছনে পড়ে মাস্তরা, পোথিবাসা, দোগল্‌ভীটা, বানিয়াকুণ্ড।

এ পথে বাসরাস্তা হবার আগে যাত্রীরা হাঁটাপথে অনেক আনন্দ উপভোগ করতেন। মনোরম প্রাকৃতিক শোভা। চটিওয়ালাদের আন্তরিক সেবাযত্নে পথের কষ্ট ভুলে যেতেন।

আজকাল পথ যত সুগম হচ্ছে হাঁটাপথ তত কমে যাচ্ছে। তাই হিমালয়ের বহু জায়গা যাত্রী অভাবে ক্রমশঃ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে। বড়জোর চলার পথে গাড়ী থেকে এক পলক চোখের দেখা।

ধর্মীয় মাহাত্ম্যের আকর্ষণ কেবল কেদারনাথ, বদ্রীনারায়ণের মত কয়েকটা কেন্দ্রবিন্দুতে আবদ্ধ। দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তপ্রকাশী, কর্ণপ্রয়াগ, উত্তরকাশী, নন্দপ্রয়াগ, যোশীমঠ প্রভৃতি যাত্রীমনে আর বিশেষ সাড়া জাগায় না।

অনেকের মুখেই শুনি—কেদার-বদ্রী ঘুরে এলাম।—ত্রিযুগী নারায়ণ গিয়েছিলেন?—না উল্টোপথে যেতে আর ইচ্ছে করল না। —হেঁটে গিয়েছিলেন নিশ্চয়!—না, ঘোড়া নিয়েছিলাম। কী দরকার রিক্স নিয়ে। ক'টা টাকার ব্যাপার তো!

ভেবে পাইনা কী উদ্দেশ্যে এঁরা হিমালয়ে যান। পুণ্যসঞ্চয়? হিমালয় ভ্রমণ? না, অমুক অমুক তীর্থ সমাপ্ত করেছি, এই আত্মতুষ্টি?

অবশ্য আরও একদল আছেন যাঁরা হিমালয়ের প্রেমে পড়ে গেছেন। হিমালয়ের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য তাঁদের নিরন্তর হাতছানি দেয়। তাছাড়া হিমালয়ের পথঘাট, নদীঝর্ণা, ঘরবাড়ী, বনজঙ্গল, দেবদেবী সবকিছুর প্রতি তাঁদের সমান আকর্ষণ। তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ হিমালয় যেন বিরাট এক দেবালয়।

চোপ্‌তা পৌঁছে গেলাম। সুন্দর জায়গা। প্রশস্ত রাস্তা। টিনের ফলকে লেখা আছে—চোপ্‌তা বাসষ্ট্যাণ্ড।

এই রাস্তা এখানে শেষ নয়। পাঙ্গরবাসা হয়ে মণ্ডলচটির দিকে নেমে গেছে।

রাস্তা থেকে ৪।৫টা ধাপ উঠে পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা ঘর, চটিওয়ালাদের আস্তানা। যাত্রী কমে গেছে বলে সকলে নেমে গেছে। একমাত্র জঙ্গল সিং আছে। শুনলাম ৮।১০ দিন পরে সেও উখীমঠ চলে যাবে।

একখানা বিরাট ঘর, সামনে এক ফালি লম্বা চত্বর। ঘরের সামনের দিকটা খোলা, দরজা বলে কিছু নেই, একপাশে সামনের দিকে রান্না-খাওয়ার জায়গা। ঘরের ভিতর অনেক লেপ গাদা করা, প্রয়োজনে যাত্রীরা ব্যবহার করেন।

সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। মঙ্গল সিং ঘি দিয়ে হালুয়া করে দিল। সঙ্গে চা, দু'একজনের জন্য চায়ের বদলে দুধ।

মঙ্গল সিং এর নিজের গরু আছে। চটি খোলার সময় সঙ্গে নিয়ে আসে। আশে পাশে বসতি নেই বলে এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

তুঙ্গনাথে রাত্রিবাস করব না। রাত্রে নাকি ভয়ানক ঠাণ্ডা। তাই পূজা দিয়ে আবার এখানে নেমে আসব। সব মালপত্র এখানে

থাকবে। সাথী মন বাহাদুর আমাদের সঙ্গে জল নিয়ে যাবে। ধন বাহাদুর ময়লা জামাকাপড় পরিষ্কার করে নেবে বলে থেকে যায়।

চোপ্‌তা থেকে তুঙ্গনাথ মাত্র ৪ কিঃ মিঃ। অবশ্য এইটুকু দূরত্বের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উঠতে হবে। বেশ চড়াই। তবে রাস্তা খুব ভাল। এত উঁচুতে এ রকম ভাল রাস্তা সাধারণতঃ চোখে পড়ে না।

অনেকের মুখে শুনেছিলাম—তুঙ্গনাথের চড়াইপথ খুব কষ্টকর। বাস্তবক্ষেত্রে তা অতিরঞ্জিত বলেই মনে হল।

বেশ চওড়া রাস্তা। ঘন অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি। নিস্তব্ধ নিবিড় বনচ্ছায়া। মাঝে মাঝে শুধু পাখীর গুঞ্জন শোনা যায়।

ক্রমশঃ গাছপালা বিরল হয়ে আসে। পরে শুধু ঢেউ খেলানো পাহাড়। পাহাড়ের এক একটা বাঁক ঘুরতেই সামনে সিধে রাস্তা। বহুদূর পর্য্যন্ত একটানা। পথের সৌন্দর্য্য অপরিসীম। আনন্দে মন ভরে যায়।

দূরে সারি সারি তুষারধবল গিরিশৃঙ্গ। চৌখাম্বা, কেদার, বদ্রী, জানা অজানা কত পর্বত চূড়া। সম্পূর্ণ দৃশ্যপট যেন পটে আঁকা ছবি।

একদিকে সবুজের মেলা, অন্যদিকে নীল আকাশের নীচে তেত্রিশ কোটি দেবতার আসন পাতা। তারই মাথার উপর যেন সারিবদ্ধ সাদা চাঁদোয়া খাটানো। কী অপূর্ব দৃশ্য।

মন্দিরে পৌঁছবার একটু আগে একটা বাঁধানো জলাধার। আকাশ গঙ্গার উৎপত্তিস্থল।

আর একটু এগুলেই তুঙ্গনাথের মন্দির। উচ্চতা ১২০৭২ ফুট। উত্তরাখণ্ডের সর্বোচ্চ তীর্থমন্দির। চারিদিকে কয়েকটা ঘরবাড়ী, দোকান পাট, ধর্মশালা। রাত্রিবাসের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

গাড়োয়ালের তীর্থপথে যেটা সমস্যা শৌচাগার, এখানে সে সবের কোন অসুবিধা নেই।

রাতে থাকা হবে না ভেবে আপশোষ হতে লাগল। ঘরবাড়ী থাকলেও লোকজন প্রায় নেমে গেছে। অক্টোবরের মাঝামাঝি। মন্দির বন্ধ হতে আর বেশী দেরী নেই। এখন গোটা দুই দোকান খোলা আছে।

পূজারী গঙ্গারাম মৈথানীকে নিয়ে মন্দির চত্বরে উঠে এলাম। চারিদিক বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

মন্দিরে লিঙ্গমূর্তি। তুঙ্গনাথে মহাদেবের বাহু প্রকাশিত। লিঙ্গের নীচে তুঙ্গনাথ সহ কেদারনাথ, মদ্‌মহেশ্বর রুদ্রনাথ ও কল্পেশ্বরনাথের মুখমূর্তি আছে। লিঙ্গমূর্তির পিছনে শঙ্করাচার্য্য ও ব্যাসদেবের মূর্তি। তুঙ্গনাথের পূজা শেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি।

পূজারী সবকিছু বুঝিয়ে বলেন। শীতের ছ'মাস মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। সে সময় মুখীমঠে তুঙ্গনাথের পূজা হয়। এখানকার পাণ্ডাদের বাসও এ মুখীমঠ বা মকুমঠ গ্রামে।

তুঙ্গনাথপাহাড়ের সর্বোচ্চধাপে অর্থাৎ একেবারে চূড়ায় চন্দ্রশিলা। মন্দির চত্বর থেকে প্রায় হাজার ফুট উঁচুতে স্বল্পপরিসর সমতল ভূমি। চারিদিক উন্মুক্ত। দিক্‌বলয়ের প্রান্তরেখা বহুদূর।

চারিদিকে হিমগিরির শুভ্রশৃঙ্গ। গা বেয়ে নেমে এসেছে বিগলিত তুষারধারা। যেন বিদ্যুৎরেখা স্থায়ী হয়ে বসে গেছে। পাদদেশে শ্যামলীমায় ঢাকা গ্রাম। গাছপালা শস্যক্ষেত্র চারণভূমি। ঝর্নার কল্লোল। পাখীর কলতান। সর্বোপরি ধ্যান গম্ভীর নিবিড় নিঃসীমতা। তুঙ্গনাথের সার্থক তপোভূমি।

পাণ্ডববাসা-মণ্ডল-অনসূয়া

॥ ৯ ॥

তুঙ্গনাথ দর্শন করে যাঁরা রুদ্রনাথের পথে মণ্ডলের রাস্তা ধরেন তাঁরা আর চোপ্‌তার পথে নামেন না। পাহাড়ের বিপরীত দিকে আর একটা রাস্তা নেমে গেছে ভুলকোনায়।

আমাদের চোপ্‌তায় ফিরতে হবে। মালপত্র সব সেখানে রয়েছে। তরতর করে নেমে আসি! সবটা পথই উতরাই। চল্লিশ মিনিটে চোপ্‌তা ফিরে এলাম।

খাবার প্রস্তুত। মঙ্গল সিং কে বলেই গিয়েছিলাম। খাওয়া দাওয়া সেরে তৈরী হতেই ২টা বেজে গেল।

এখন আমাদের চলার পথ মণ্ডলের দিকে, সড়কপথে চোপ্‌তা থেকে মণ্ডল ২৫ কিঃ মিঃ। পাকা চওড়া রাস্তা। পাশাপাশি দু'খানা বাস চলতে পারে। অথচ কোন যানবাহন নেই।

মাঝে মধ্যে বরাত ভাল হলে পি, ডব্লু' ডি'র ট্রাক মেলে। অনুরোধে খানিকটা এগিয়েও দেয়। একমাত্র সে ভরসায় এগুনো ঠিক হবে না, পাকারাস্তা ধরে হেঁটে সন্ধ্যার মধ্যে পৌঁছানো অসম্ভব। তাছাড়া পথে কোথাও চটি আছে কিনা তাও জানা নেই।

একমাত্র উপায় জঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া। মঙ্গল সিং এর হিসাবে দূরত্ব ১৫।১৬ কিঃ মিঃ। উপায় স্থির করার ভার সাথীদের উপর ছেড়ে দিলাম।

জঙ্গলের পথে যাওয়াই সাব্যস্ত হ'ল। তবে সবাইকে একটু দ্রুত চলতে হবে।

যতীনদার মুখের দিকে তাকালাম। মনে হ'ল ভিতরে ভিতরে

সাহস সঞ্চয় করছেন। বলেন—যেমন করেই হোক মঙ্গলচণ্ডীতে পৌঁছতে হবে, এই তো?—মঙ্গলচণ্ডী নয়, মণ্ডলচটি।—ওই হোলো; অত মনে রাখা যায় না।

ওরকম আরও কয়েকটা নাম যতীনদা প্রায় ভুল করে বলেন, উরগমকে দুর্গম, হেলাং কে শিলং, লেঙ্ককে লেবং। আমরা হাসাহাসি করি। যতীনদাও হাসেন। তবে মনে মনে রেগে যান কিনা মুখ দেখে বোঝা যায় না।

ভুলকোনা ছাড়িয়ে বাঁদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। মণ্ডলচটি পর্য্যন্ত প্রায় সবটা উতরাই। রাস্তা বলে কিছু নেই। পায়ে চলার দাগ। তাও মাঝে মাঝে ডালপালা, লতাপাতায় ঢাকা পড়ে গেছে। জঙ্গলের পথে চলতে চলতে অনেকবার পাকা রাস্তা ডিঙোতে হয়। তখনই বুঝতে পারি কত ঘুরে ঐ রাস্তা নেমেছে।

জঙ্গলচটির কাছে এক জায়গায় একটা বোর্ড দেখতে পেলাম। লেখা—কস্তরীমৃগ বিচরণ-ভূমি। ভাবি, হঠাৎ হয়ত দেখা মিলতে পারে। কিন্তু না, সকলের অনুসন্ধিৎসা বৃথা গেল।

চারটা নাগাদ জঙ্গলচটি পৌঁছে গেলাম। না, বিশ্রাম নেবার মত হাতে সময় বেশী নেই। এখনও অনেক পথ হাঁটতে হবে। অতএব এগিয়ে চল।

মুখে কেউ কিছু না বললেও বুঝতে পারছি, একটানা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে।

পাঙ্গরবাসা। কয়েক ঘর লোকের বাস। দোকান পাট কিছুই চোখে পড়ল না। মোটর রাস্তা হওয়াতে এ স্থানের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে।

মণ্ডল এখনও পাঁচ মাইল। এদিকে ঘড়িতে পাঁচটা। আর এগুনো উচিত হবে কিনা ভাবছি। স্থানীয় লোকেদের নাকি এক ঘণ্টা লাগে। আমাদের না হয় দেড় ঘণ্টা লাগবে।

ভরসারও একটা কারণ ঘটল, এক নববধূ স্বামীসহ মণ্ডলে বাপের বাড়ী চলেছেন। একসঙ্গে রওনা দিলাম।

কিছুদূর এগিয়ে বুঝতে পারলাম পাহাড়ীপথে কোন অবস্থাতেই স্থানীয় লোকের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না। তারা কাঠবিড়ালির মত কী সুন্দর তরতর করে এগিয়ে চলে। পদক্ষেপ যেন ছন্দোবদ্ধ। আমরা জঙ্গলাকীর্ণ বন্ধুর পথে অতিকষ্টে দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছি। তাই গতিও মন্থর হতে বাধ্য।

কিছুক্ষণের মধ্যে সহযাত্রীরা বনপ্রান্তে মিলিয়ে গেল। এখন মনে হচ্ছে ওদের একঘণ্টার পথ আমাদের কমপক্ষেও তিনঘণ্টা লাগবে।

ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে আসছে। একে ঘন অরণ্য, তাতে নিঃশ্চিদ্র অন্ধকার। সঙ্গে একটামাত্র টর্চ, তাও ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেছে। যাত্রী সাতজন। আবার পাশাপাশি দু'জন চলারও উপায় নেই। ঠিক হল দলের বার আর পাঁয়ষট্টি টর্চহাতে আগে আগে যাবে। বাকীরা অনুসরণ করবে।

এভাবে পথ চলা খুব কষ্টকর। অন্ধকারে সাপ খোপের কথা বাদ দিলাম। ঝোপঝাড় ডালপালা গাছের গুড়ি এবং জালের মত ছড়ানো শিখর। তারি মধ্যে অন্ধকারে হাতড়ে পথ চলা। অথচ দিনের আলোয় এপথ অতি মনোরম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পথের ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়।

চোপ্‌তা থেকে এপথে মণ্ডলে আসতে হ'লে দুপুর বারটার মধ্যে রওনা হওয়া উচিত। মোটকথা সন্ধ্যার পর কিছুতেই এপথে চলা উচিত নয়। তবে আজকাল এপথে যাত্রীরা বড় একটা কেউ আসেন না। ট্রাক, জীপ্‌, ট্যাক্সি, যাতেই হোক পাকা রাস্তার ঘুর পথে যাতায়াত করেন। দশ বার মাইল হাঁটা পথের কষ্ট হয়ত লাঘব হ'ল। কিন্তু হারাতে হ'ল প্রাকৃতিক সুষমামণ্ডিত এক মনোরম অরণ্যপথের মাধুর্য্য। বলতে দ্বিধা নেই, আধুনিক সভ্যতার

ফসল নতুন নতুন রাস্তাঘাট এবং দ্রুতগতি যান বাহনের দৌলতে বহু রমনীয় পরিবেশ আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে সরে গেছে। ভবিষ্যতে আরও যাবে।

হিমালয় প্রেমিকদের সুখ বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপও। বাসে যেতে যেতে সেই ছায়াঘেরা বনবীথিকার কথা মনে পড়বেই। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাসও।

রাত সাড়ে সাতটায় মণ্ডল পৌঁছে গেলাম। দেখলাম পুরোনো ধর্মশালাটা বন্ধ। বোধ হয় যাত্রী অভাবে।

আমরা বাসষ্ট্যাণ্ডে চলে এলাম। পাশেই বলবন্ত সিং এর হোটেল। দোতলায় দু'খানা ঘর নিলাম। উপরের সব ঘর যাত্রী-দের ভাড়া দেওয়া হয়। অবশ্য কিছু স্থায়ী ভাড়াটেও আছে। নীচের সবটাই দোকান ও হোটেল। আশেপাশে আরও কয়েকটি দোকান আছে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বালখিল্যগঙ্গা।

বলবন্ত সিং সাগর গ্রামের ইস্কুলের শিক্ষক। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভাই গুলবন্ত সিং এই হোটেল চালান। সবাই খুব সজ্জন।

যতীনদা ঘরে ঢুকে হোমিওপ্যাথির ওষুধের বাক্স খুলে বসলেন। পথে এক জায়গায় গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে হাঁটুতে ভয়ানক ব্যথা পেয়েছেন।

ব্যথার সেই নির্দ্দিষ্ট ওষুধটা নেই। ঘরের কর্ত্রী দিতে হয়ত ভুলে গেছেন। এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ব্যথার আধিক্যহেতু এইমুহূর্তে যেন ক্ষমার অযোগ্য। গজর গজর করতে করতে অবশেষে দাদু ভাইয়ের কাছ থেকে অম্রুতাঞ্জন নিয়ে হাঁটুতে মালিশ করতে বসে গেলেন। সকালেই তো আবার যাত্রা সুরু করতে হবে।

অনসূয়া দেবীর মন্দির। মণ্ডলচটি থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার, সবটাই চড়াই।

মণ্ডলচটি ছাড়িয়ে প্রথমেই একটা গ্রামের মধ্যদিয়ে পথ। সিরোলি গ্রাম। গোটাকয়েক ঘড়বাড়ী। বাড়ীগুলির উঠোনের

মধ্য দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা। মেয়েরা গৃহস্থালীতে ব্যস্ত। ভিন্-দেশী যাত্রীদের দিকে কৌতূহলভরে তাকায়।

পাথরের ধাপ দিয়ে বাড়ীর সীমানায় পাঁচিল দেওয়া। বাঁধানো উঠোনে রামদানা শুকোচ্ছে। আশেপাশে সবজী ক্ষেত। নদীর জলধারাকে বাঁধ দিয়ে ইচ্ছামত খেতের পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হ.য়ছে।

গ্রাম ছাড়িয়ে জঙ্গলের পথ। কিছুদুর এগিয়ে অমৃতগঙ্গা পার হলাম। কাঠের পুল। এখান থেকে প্রকৃত চড়াই সুরু। ছায়া-ঘেরা মনোরম পথ। স্বচ্ছন্দে যাওয়া চলে। আমরা সবাই এগিয়ে চলি।

অনসূয়া দেবীর মন্দির। অরণ্য উপত্যকার কোলে। নিঃসর্গ সৌন্দর্য্য উপভোগ করার ..ত।

এ স্থানের উচ্চতা ৬৫০০ ফুট।

মন্দির অভ্যন্তরে দেবী অনসূয়া। অনসূয়া মায়ি। আর অত্রিমুনি। অনসূয়া ছিলেন অত্রিমুনির স্ত্রী।

অনসূয়া দেবী এবং অত্রিমুনি সম্বন্ধে পুরাণ কাহিনী ছাড়াও অনেক লোকপ্রবাদ প্রচলিত।

ব্রহ্মা লোকসৃষ্টির ব্যাপারে ঋষিশ্রেষ্ঠ অত্রি আর সতী অনসূয়াকে আদেশ করলেন। ব্রহ্মার ইচ্ছা পূরণের জন্য উভয়ে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হন।

এই কঠোর সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবানের কাছে সন্তান প্রার্থনা।

তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের দেহ ধারণ করে ঋষি দম্পতির সামনে উপস্থিত। তাঁরা বললেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনি জগদীশ্বরের সৃষ্টিশক্তি আয়ত্ত করার সাধনায় সফল হয়েছেন। আমরা তিনজনেই সেই শক্তির আধার। অতএব আমাদের শক্তি অংশে আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

সতী অনসূয়ার পুণ্যগর্ভে জন্ম নিল—ব্রহ্মার শক্তি অংশে সোম, বিষ্ণুর শক্তি অংশে দত্তাত্রেয় এবং মহেশ্বরের শক্তিঅংশে দুর্বাসা।

দেবী অনসূয়ার মাহাত্ম্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল! অনসূয়া মায়ীর পূজা দিতে বহু যাত্রী আসেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সন্তান কামনায়।

পুরাণ কাহিনী ছাড়া দেবীর সতীত্ব মাহাত্ম্য নিয়েও অনেক কাহিনী প্রচলিত।

মর্ত্যের এই সতীর খ্যাতি ত্রিভুবনে ছড়িয়ে পড়ল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ঘরণীরা চিন্তিত। পাছে নিজেদের সতীত্বমহিমা খর্ব হয়ে যায়। ক্রমে মনে ঈর্ষা জাগে। স্বামীদের প্ররোচিত করেন এই মর্ত্যবাসিনী সতীর যশ অপযশ দিয়ে ঢেকে দিতে।

গৃহিনীর অবাধ্য হতে দেবতারাও ভরসা পান না। মর্ত্যে ছুটে যান। একেবারে অত্রিমুনির আশ্রমে। তিন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে।

যতসব অদ্ভুত আবদার করেন দেবী অনসূয়ার কাছে। কখনও বা অশালীন প্রস্তাব।

সাধ্বী স্ত্রী অনন্যোপায় হয়ে স্বামীকে স্মরণ করেন।

অত্রিমুনির ধ্যান ভেঙ্গে যায়। আশ্রমে এসে অনসূয়ার কাছে অতিথিদের আচরণের কথা শোনেন। স্মিতহাস্যে স্ত্রীকে অভয় দেন।

মুনিশ্রেষ্ঠ কমণ্ডলু হাতে অতিথিদের দিকে এগিয়ে যান। কমণ্ডলুর মন্ত্রঃপূত জল অতিথিদের উপর ছিটিয়ে দেন। ছদ্মবেশী দেবতাদের কপট অভিলাষ দূরীভূত হয়। তাঁরা নিজরূপে প্রকাশিত হন এবং অকপটে আত্মত্রুটি স্বীকার করেন।

মর্ত্যসতী অনসূয়া দেবীর মহিমা স্বর্গমর্ত্যে ছড়িয়ে পড়ল। পূজার প্রচলন হল। 'বর্ষে বর্ষে দলে দলে' বহুযাত্রী আসেন। কেউ বা কামনা নিয়ে। বিশেষতঃ সন্তান কামনা।

অনসূয়া মায়ের পূজা দিয়ে সভক্তি প্রণাম করেন।

অত্রিমুনির মন্দির আরও আড়াই কিলোমিটার দূরে। প্রথমে চড়াই, পরে খানিকটা উতরাই। এই পথে জন সমাগম নেই বললেই চলে। তাই পথরেখাও অস্পষ্ট।

অত্রিমুনির তপস্যাস্থলের নাম অমৃতকুণ্ড। প্রবহমান এক ঝর্ণা থেকে এই কুণ্ডের সৃষ্টি। এই কুণ্ড থেকে যে জলধারা নীচে বয়ে চলেছে তার নাম অমৃতগঙ্গা।

অনসূয়া মন্দিরের পূজারী বংশীধর। বহু পরিচিত কৃষ্ণমণির মেজভাই। ছোটভাই পুরুষোত্তম। আসলে এঁদের মা'র হাতেই যাত্রীদের মন্দিরের সবকিছু পরিচালনার ভার। ইনি সকলের কাছে মাতাজী। দেখাশুনা থাকা খাওয়া সবকিছু তিনিই তদারক করেন।

যাত্রীদের জন্য মন্দির সংলগ্ন কয়েকটা ঘর আছে। তাতে একসঙ্গে বহুযাত্রীর স্থান সংকুলান হতে পারে।

পূর্বেকার পূজারী কৃষ্ণমণি এখন এখানে থাকেন না। মণ্ডলে স্কুল মাস্টারি করেন। সপরিবারে সেখানেই থাকেন। মাঝে মধ্যে এসে সবকিছু দেখে যান।

তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন কেননা রুদ্রনাথের সঠিক পথের খবর নাকি তাঁর কাছেই পাওয়া যাবে। কলকাতায় অনেক হিমালয় প্রেমিক বন্ধুর কাছেও তাঁর কথা শুনেছি। তাঁরা সকলেই বার বার সাবধান করে দিয়েছেন যেন কৃষ্ণমণির পরামর্শ ছাড়া রুদ্রনাথের পথে পা না বাড়াই।

তবে মাতাজীর কাছে শুনলাম—অনসূয়া থেকে রুদ্রনাথের পুরানো রাস্তা এখন বন্ধ। সংস্কার হচ্ছে। সরকারী কর্তৃপক্ষের হিসাবে আরও ৩।৪ বছর লাগবে।

এখান থেকে বহুদূরের রুদ্রনাথের পাহাড় দেখা যায়। সাথী ধনবাহাদুর হাত দিয়ে দূরে সেই পুরানো পথরেখা দেখিয়ে দেয়। এই পথে আগে সে একবার যাত্রী নিয়ে গিয়েছিল।

সুশীল রায়চৌধুরী, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, ভাস্কর চৌধুরী, প্রবোধ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ হিমালয় প্রেমিক বন্ধুরা এপথে রুদ্রনাথ ঘুরে এসেছেন। তাঁদের কাছে এপথের দুর্গমতা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। পথ বেশ কষ্টসাধ্য। মাঝে মাঝে বিরাট চড়াই।

অতএব পথের সঠিক খবর আগেই নিতে হবে। তাই রুদ্রনাথ যেতে হলে আগে কৃষ্ণমণির সঙ্গে দেখা করা দরকার।

॥ ১০ ॥

দিনের শেষে অনসূয়া থেকে মণ্ডলে ফিরে এলাম। হোটেলে পা দিয়েই শুনি কৃষ্ণমণি স্বয়ং আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। লোকের মুখে শুনেই চলে এসেছেন।

শ্যামলা, লম্বা একহারা চেহারা। কপালে চন্দনের ফোঁটা। মিষ্টভাষী। অনসূয়া রুদ্রনাথ যাত্রী প্রায় সকলের কাছে এই মানুষটার নাম শুনেছি। এবার চোখে দেখলাম। আলাপ পরিচয় হ'ল। অনেক কথা। অতীতের অনেক স্মৃতি। অনেক যাত্রী এবং যাত্রাপথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আমরা সকলে তন্ময় হয়ে শুনি।

রুদ্রনাথের পথের কথা উঠতেই তিনি বলেন—রুদ্রনাথ যাবার তুলনায় নিরাপদ রাস্তা হচ্ছে সগর বা সাগর গ্রাম হয়ে। মণ্ডল থেকে গোপেশ্বর যাবার পথেই এই সাগর গ্রাম।

আরও দুটি রাস্তা আছে। একটা অনসূয়া হয়ে আর একটি কল্পেশ্বর এবং ডুমক্ গ্রাম হয়ে।

আগেই বলেছি অনসূয়া হয়ে আজকাল কোন যাত্রী রুদ্রনাথ যান না। স্থানীয় পাহাড়ী দু'চারজন ছাড়া। পথ বলতে সত্যিই কিছু নেই। তবে সরকারী কনস্ট্রাকসন বিভাগ রাস্তা তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে। বছর তিনেকের মধ্যে কাজ শেষ হবার কথা।

কল্পেশ্বর ডুমক হয়েও একই অবস্থা। স্থানীয় লোকজন ছাড়া আজকাল যাত্রীরা বড় একটা যাতায়াত করেন না। তাছাড়া এপথে সময়ও বেশী লাগে। কমপক্ষে দু'দিন তো বটেই।

অতএব একমাত্র প্রশস্ত রাস্তা সাগর হয়ে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য নতুন রাস্তা তৈরী হয়েছে। প্রায় ছ'ফুট চওড়া। দূরত্ব ও খুব

বেশী নয়। সাগর থেকে খুব ভোরে রওনা দিলে সন্ধ্যায় অনায়াসে রুদ্রনাথ পৌঁছে যাওয়া যায়।

সাগর থেকে সরকারী হিসাবে রুদ্রনাথের দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার।

আগেও বলেছি আবার বলছি—ও সব পাহাড়ী পথে মাইলের হিসাব সমতলের মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়।

অনেকের মুখেই শুনেছি—রুদ্রনাথের পথে গাইড নাকি অপরিহার্য্য। কৃষ্ণমণিকে বললাম,—একজন অভিজ্ঞ লোক দিতে।

কৃষ্ণমণি বাধা দিয়ে বললেন—নতুন পথে গাইড-এর প্রয়োজন হবে না। বিশেষতঃ দু'জন নেপালী সাথী যখন সঙ্গে রয়েছে।

তারা পাশেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলে উঠল—বাবু, আমরাও পাহাড়ী লোক। পাহাড়ী পথের নাড়ীনক্ষত্র আমাদের জানা। আপনি অনর্থক ভয় পাচ্ছেন।

মনে মনে বললাম, ভয় কি আর সাধে পাচ্ছি—! যাঁরাই গেছেন, প্রত্যেকেই পথের দুর্গমতাকে স্বীকার করেছেন। তা'ছাড়া আমার দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণও রয়েছে।

আগেই বলেছি, আমার সহযাত্রী—আমার স্ত্রী, ১২ বছরের ছেলে, ১৫ বছরের মেয়ে, আর এক ৬২ বছরের বৃদ্ধ।

যেখানেই গেছি আমার সহযাত্রীদের দেখে সকলেই আমার সাহসের তারিফ করেছেন।

বলেছেন—পঞ্চকেদারের পথে এরকম বয়সের দল সাধারণতঃ দেখা যায় না।

লোকের কথায় বাড়তি সাহস পাই। কিন্তু চলার পথে মনের কোণে দুশ্চিন্তারও অন্ত থাকে না।

যখন দেখি পাহাড়ী নির্জন পথে ঝড়-জল শুরু হয়েছে। গন্তব্য-স্থল তখনও দূরে। ক্ষীণ আলোয় অপ্রশস্ত পিচ্ছিল পথে চলতে চলতে সকলের মুখের দিকে তাকাই। সাহস দিয়ে বলি—কোন ভয় নেই, সাবধানে এগিয়ে চল, পাহাড়ী ঝড়বৃষ্টি একটু পরেই থেমে যাবে।

সাথীরাও হয়ত আমার মনের ভাষা বুঝতে পারে। তাই তারাও অভয় দিয়ে বলে—আমরা থাকতে কিসের চিন্তা? দরকার হ'লে কাঁধে করে পৌঁছে দেব।

তাদের কথা মনে সাহস যোগায়। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি—সামান্য অর্থের বিনিময়ে কী অপরিসীম নির্ভরতা।

যাই হোক গাইড ছাড়াই যাব স্থির হল। আর দেরী নয়, কাল ভোরেই।

মণ্ডল থেকে সাগর ৯ কিলোমিটার। পাকা রাস্তা। বাস চলে।

হোটের মালিক বলবন্ত সিং এর বড়ভাই গোপেশ্বরে ট্যাক্সি চালান। ভদ্রলোক আগে সেনাদলে কাজ করতেন। বর্তমানে মণ্ডলের বাসিন্দা। রোজ রাত্রে গাড়ী নিয়ে মণ্ডলে নিজের বাড়ীতে চলে আসেন।

আবার খুব ভোরে গোপেশ্বরে চলে যান। ঠিক হল খুব ভোরে গোপেশ্বর যাওয়ার পথে তিনি আমাদের সাগর গ্রামে পৌঁছে দেবেন। সেখান থেকেই রুদ্রনাথের হাঁটাপথের সুরু।

আনন্দ এবং উত্তেজনার মধ্যে একটা ব্যাথার সুর আমাদের সকলকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এতদিনের যাত্রাপথের সহযাত্রী যতীনদাকে এই প্রথম একলা রেখে এগুতে হবে। পথশ্রমে ক্লান্ত এই বৃদ্ধকে রুদ্রনাথে নিয়ে যাবার সাহস আমার নেই। তিনি নিজেও লোকমুখে রুদ্রনাথের দুর্গম পথের কথা শুনে প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও যেতে সাহস করেন না।

তিনি গোপেশ্বরে 'হিল ভিউ হোটেলে' আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

ভোর হতে এখন ঘণ্টাখানেক বাকী। সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে হবে। ঠিক পাঁচটায় রওনা হবার কথা।

সারাদিন পথে খাবার মত পরটা তরকারী আর কিছু লাড্ডু নিয়ে নিলাম। চাল ডাল আলু চা চিনি বিস্কুট আগেই সংগ্রহ করে রেখেছি। জলের পাত্রগুলি ভরে নিলাম। অবশ্য এপথে মাঝে মাঝে ঝর্ণার ধারা মেলে।

সওয়া পাঁচটায় ট্যাক্সি ছাড়ল। কুড়ি মিনিটের মধ্যে সাগরগ্রামে পৌঁছে গেলাম।

যতীনদা ছাড়া আমরা সবাই প্রয়োজনীয় মালপত্র নিয়ে নেমে পড়লাম। ঐ ট্যাক্সি করেই যতীনদা গোপেশ্বর চলে যাবেন। ঠিক হল গোপেশ্বরে হিল ভিউ হোটেলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

সাগর বা সগ্‌গর গ্রাম। আয়তনে ছোট হলেও বেশ বসতিপূর্ণ। ঘরবাড়ী দোকানপাট প্রাইমারী স্কুল সব আছে। তাছাড়া এখান থেকে গোপেশ্বরের দূরত্ব মাত্র ৪ কিলোমিটার। পাকা রাস্তা। স্থানীয় লোকেদের কাছে মসৃণপথে এ দূরত্ব অনেকটা এবাড়ী ওবাড়ী।

রাস্তার পাশেই একটু উঁচুতে একটা কাঠের ফলক পোঁতা আছে। তাতে রুদ্রনাথের দূরত্ব এবং পথ নির্দেশ দেওয়া আছে। দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার কিন্তু স্থানীয় লোকদের হিসাবে ১১ মাইল।

গভীর বিষাদের সঙ্গে যতীনদাকে বিদায় দিলাম। এবার আমরা বাঁদিকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রুদ্রনাথের পথে রওনা হব।

জয় বাবা রুদ্রনাথ।

আমরা এগিয়ে চলি। প্রথমে ধনবাহাদুর তারপর আমি তারপর স্ত্রীপুত্রকন্যা সব শেষে মনবাহাদুর।

প্রভাতের শিশির ভেজা পথ। পথের চিহ্ন কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগুচ্ছি। জঙ্গল কোথাও পাতলা, কোথাও কিঞ্চিৎ ঘন। সর্বত্র পাখীর কলতানে মুখর। নির্জন শান্ত এই পরিবেশে মানুষের উপস্থিতিকে হয়ত তারা সরবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

প্রথম প্রথম রাখাল বালক কিংবা জ্বালানীর জন্য ডালপালা সংগ্রহকারী দু'একজন মানুষের দেখা মিলল। কিন্তু ২।৩ কিলোমিটার পর থেকে একেবারে মন্দির পর্যন্ত পথে কোন মানুষের দেখা মেলেনি।

খানিকটা এগোবার পর জায়গায় জায়গায় জঙ্গলের চিহ্ন মাত্র নেই। ন্যাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে মানুষের তৈরী সর্পিল পথ এগিয়ে চলেছে। বিরল তদারকির চিহ্ন কয়েক জায়গায় বেশ স্পষ্ট। মুকুলিত লতাগুল্ম পথের সঠিক নিশানায় বিঘ্ন ঘটায়। তাই মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট পথরেখা খুঁজে বের করে নিতে হয়। তবে স্থানীয় লোকেরা শুনেছি চোখ বন্ধ রেখেও এপথে চলতে পারে।

নির্দিষ্ট ব্যবধানে সহজে দৃষ্টি পড়ে এমন একটা পাথরের গায়ে হিন্দিতে কিলোমিটারের সংখ্যা নির্দেশ করা আছে। প্রতি কিলোমিটারের ব্যবধানে নতুন উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। পথের ক্লান্তি ভুলে পরবর্তী সংখ্যাটার সম্মুখীন হতে প্রবল আগ্রহে এগিয়ে চলি।

হঠাৎ পথরেখা যেন বেশ অস্পষ্ট মনে হচ্ছে। এতক্ষণ যে পথে এসেছি সেটা প্রায় সর্বত্র চার থেকে ছ'ফুট চওড়া। স্পষ্ট চিহ্নিত পথ। পথের মাঝখানে তেমন কোন ঘাস কিংবা আগাছা দেখিনি।

কিন্তু এপথ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পদচিহ্ন একরকম নিশ্চিহ্ন। সারা পথ লম্বা ঘাস আর আগাছায় ভর্তি। তাছাড়া দু'পাশ থেকে গাছের ডালপালা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাত দিয়ে ঠেলে কোন রকমে এগুতে হচ্ছে।

কিন্তু এরকম তো হবার কথা নয়। পথ যে সর্বত্র স্পষ্ট এবং সুরক্ষিত। মনের কোণে সন্দেহ দেখা দেয়। সামনে এগিয়ে চলা ধনবাহাদুরকে দাঁড়াতে বলি।

ততক্ষণে সকলে কাছাকাছি এসে গেছি। আমার সন্দেহের কথা

ধনবাহাদুরকে জানাই। তার ধারণা—রুদ্রনাথের দুর্গম পথে যাত্রী সমাগম কমহেতু পথঘাটের এই অবস্থা।

যুক্তিটা হয়ত ঠিক। তবুও মন সায় দিল না। কারণ এতক্ষণ যে পথে এসেছি, সে পথের সঙ্গে এপথের আকাশ পাতাল প্রভেদ। না না, এ হতে পারে না। নিশ্চয় কোথাও ভুল থেকে যাচ্ছে।

অপর সাথী মনবাহাদুরও দেখলাম দ্বিধাগ্রস্থ। সে তাদের ভাষায় ধনবাহাদুরকে কী যেন বলল। মনে হ'ল সেও তার সন্দেহের কথাই বলছে।

সর্বনাশ! তবে কি আমরা ভুল পথে চলে এসেছি।

গৃহিনীর চোখে মুখেও শঙ্কার ভাব ফুটে উঠেছে। স্বাভাবিক। এই দুর্গম পথে ছেলেমেয়ে দুটোও যে সহযাত্রী।

ধনবাহাদুর কিন্তু,—ভুল পথে এসেছি এটা মেনে নিতে পারছে না? অভিজ্ঞতার আভিজাত্যে হয়ত লাগছে। আমাকে লক্ষ্য করে সে বলল—কোন ভয় নেই, আমার পিছনে পিছনে আসুন।

দ্বিধা নিয়েই এগিয়ে চলি। খানিকদূর এগিয়ে একটা ক্ষীণ ঝর্ণা-ধারার কাছে চলে এলাম। পাহাড়ের গা বেয়ে তির তির করে জল গড়িয়ে পড়ছে। পাহাড়টা একেবারে ন্যাড়া। একবিন্দু ঘাস পর্য্যন্ত নেই। শুধু কালো পাথর। তারই গায়ে ফুট খানেক চওড়া খাঁজের মত পথ। তাও অবিরাম জলের ধারায় বেশ পিচ্ছিল। অতি কষ্টে হাত ধরাধরি করে সকলে পার হলাম।

তবে যে শুনেছিলাম পথ সব জায়গায় কমবেশী অন্ততঃ ৫।৬ ফুট চওড়া। তবে কি ধ্বস নেমে এ অবস্থা?

হতে পারে—। নীচে ছোট বড় অসংখ্য পাথরের চাঁই। হিমালয়ের বুকে মানুষের তৈরী পথ প্রকৃতির খেয়ালে মুহূর্তে পাল্টে যেতে পারে। মনের মধ্যে নানান্ চিন্তার জাল। তবুও এগিয়ে চলি।

পথের একই চেহারা। পথ বলে নির্দিষ্ট কিছু নেই। লম্বা ঘাস

আর অনুচ্চ আগাছায় ভরা অপ্রশস্ত পথ। দেখে মনে হয় বহুদিন এপথে কেউ চলাচল করে নি।

পায়ের সামনে থেকে কী যেন একটা নেমে গেল! তবে কি সাপ? হ্যাঁ সাপই তো। গাঢ় সবুজ রঙ। যেন একটা গাছের সবুজ ডাল। লম্বায় প্রায় চারফুট। হয়ত ঘাসের মধ্যেই বিশ্রাম নিচ্ছিল। ঘাসের রঙের সঙ্গে মিশে ছিল, তাই হয়ত ধনবাহাদুরের নজরে পড়ে নি।

—ভাগ্যিস্ মাড়িয়ে দেয় নি। পরে শুনেছি,—ও সাপের বিষ ভয়ানক। তবে সহজে নাকি কামড়ায় না। আমার ডাকে ধন-বাহাদুরও সাপটাকে এক পলক দেখে নিল।

এবার কিন্তু ধনবাহাদুরের চোখে-মুখেও উৎকণ্ঠার ভাব ফুটে উঠেছে। আগের সে প্রত্যয় আর নেই।

পিঠের বোঝা নামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। মাথা নীচু করে কী যেন ভাবে।

ততক্ষণে মনবাহাদুরও কাছে এসে দাঁড়ায়। প্রত্যয়ের সুরে বলে —নিশ্চয় আমরা ভুল পথে চলেছি। নতুন তৈরী পথ এরকম হতেই পারে না। মাস তো দূরের কথা, কয়েক বছরের মধ্যেও এপথে কেউ আসে নি। ধনবাহাদুরকে লক্ষ্য করে বলে—বাবুরা না বুঝতে পারে, তুই তো পাহাড়ী। ঘাস আর জঙ্গলের চেহারা দেখে বুঝতে পারছিস্ না—যে এপথে বহুদিন কেউ হাঁটেনি।

ধনবাহাদুর এবার কিন্তু কোন প্রতিবাদ করে না। একটু থেমে বলে—তুই বাবুদের নিয়ে এখানে অপেক্ষা কর। আমি একটু এগিয়ে দেখে আসি। পলকের মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমি হোল্ডলের উপর বসে পড়ে আকাশ পাতাল ভেবে চলেছি। সত্যিই ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে। গাইড ছাড়া আসাটা মোটেই উচিৎ হয় নি। ঠিক আছে, আজ না হয় নেমে যাব। একজন গাইড নিয়ে কাল না হয় আবার যাত্রা করব।

—ঐ তো, ধনবাহাদুর ফিরে আসছে। কি ব্যাপার? ওরকম ছুটে আসছে কেন? দূর থেকে বলতে থাকে—বাবু, ফিরে চলুন। ভুল পথে এসে গেছি—।

কী ব্যাপার?

হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলে—এগিয়ে চলুন, পরে বলছি—। তার ভীতি-বিহ্বল আচরণ দেখে কেউ আর কোন প্রশ্ন না করে দ্রুত ফিরে চলি।

সকলেই উস্‌খুস্‌ করছি ব্যাপারটা জানার জন্য। একটু পরে ধনবাহাদুর বলতে থাকে—বাবা রুদ্রনাথ আমাদের বাঁচাতে চর পাঠিয়েছেন।

সকলে হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। সে বলে যায়। —খানিক এগুতেই দেখি পথটা হঠাৎ নীচের দিকে নেমে গেছে। কতটা নেমে গেছে দেখতে পেলাম না। পথ জুড়ে এক অদ্ভুত জীব বসে আছে। অনেকটা গোসাপের মত। তবে মুখটা তুলনায় বড়। চোখ দু'টো জ্বলছে। আর মাঝে মাঝে বিকট হাঁ করে জিবটা লম্বা করে আবার ভিতরে টেনে নিচ্ছে।

—বিশ্বাস করুন বাবু, এরকম অদ্ভুত জীব আমি কখনও দেখিনি। নিশ্চয় বাবা রুদ্রনাথ আমাদের পথ আগলে সাবধান করে দিলেন।

ধনবাহাদুরের বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনে কোনরকম মন্তব্য করার সাহস হ'ল না। আমরা শহুরে মানুষ। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালকে নিয়তির অমোঘ নির্দেশ বলে বিশ্বাস করতে দ্বিধা করি। তবুও কেন জানিনা ধনবাহাদুরের এই সংস্কারনিষ্ঠ দৃঢ় বিশ্বাস কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারলাম না।

আমার ধারণা এটা পরিবেশের মাহাত্ম্য। ঐ পরিবেশে ঐ অবস্থায় কোন বস্তুনিষ্ঠ মানুষ ধনবাহাদুরের বিশ্বাসকে অবজ্ঞায় উড়িয়ে দিতে পারবে না।

—ঐ তো আসল পথ। মনবাহাদুর চীৎকার করে উঠে।

—সত্যিই তো। তবে আমরা এপথে গেলাম কি করে?

এতক্ষণে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আমরা যেখান থেকে সোজা ভুল পথে চলে গেছি, তার ঠিক ডান দিকে বাঁক নিয়ে আসল পথটা উঠে গেছে। আমরা তা লক্ষ্য না করে সোজা এগিয়ে গেছি।

পরে জানতে পেরেছি দু'একবছর আগেও স্থানীয় লোকেরা এপথে অনসূয়ার পার্শ্ববর্তী স্থানে যাতায়াত করত। এখন ওপথ প্রায় পরিত্যক্ত।

হঠাৎ ছেলেমেয়ের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তারা চটকরে ক'টা গাছের শুকনো ডাল সংগ্রহ করে নিয়ে এল। ভুল পথের মুখে সেগুলোকে আড়াআড়িভাবে রেখে দড়ি দিয়ে বাঁধতে শুরু করে দিল। যাতে কেউ আর আমাদের মত ভুলপথে না যায়।

ভুলের খেসারৎ দিতে দেড় ঘণ্টা সময় বৃথা নষ্ট হয়ে গেল। যাই হোক ঐ সময়টুকুর ঘাটতি পূরণ করার সঙ্কল্প নিয়ে আমরা নব উদ্যমে চলতে সুরু করলাম।

—আহা, কি সুন্দর পথ। এখন বেশ মনে হচ্ছে—কী বোকামীই না করেছি। পথের এত পার্থক্য তবুও ভুল বুঝতে কত দেরী হ'ল।

গৃহিণীর কথায় সব অনুশোচনার পরিসমাপ্তি ঘটল।—সবই রুদ্রনাথের ইচ্ছা। এ যেন ধনবাহাদুরের সেই বিশ্বাসকে সশ্রদ্ধ অনুমোদন।

বেলা প্রায় ১০টা। মাত্র পাঁচ কিলোমিটার এগিয়েছি। ধনবাহাদুর নীচে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়—ঐ দেখুন গোপেশ্বর। আর ঐ দূরে যে কয়েকটা ঘরবাড়ী দেখতে পাচ্ছেন ওটা হচ্ছে মণ্ডল।

সত্যিই এখান থেকে গোপেশ্বর পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। বেশ বড় জায়গা। অনেক ঘরবাড়ী, আমাদের তো যেতেই হবে। যতীনদা আমাদের জন্য ওখানেই অপেক্ষা করছেন।

আপাততঃ একটু বিশ্রাম করা যাক্। সকলেই হাত পা ছড়িয়ে

বসে পড়লাম। এই সময় কিছু খেয়ে নিলে হয়। নতুবা খাবার জন্য আবার সময় নষ্ট হবে।

আকাশে মেঘের আনাগোণা চলছে। বিকালের দিকে আবহাওয়া কেমন থাকবে বলা মুস্কিল। সন্ধ্যার আগে যেমন করে হোক পৌঁছতেই হবে।

পঞ্চকেদারের মধ্যে দুর্গমতর কেদার এই রুদ্রনাথ। অতএব একমুহূর্ত সময় নষ্ট করা যাবে না। চল,—এগিয়ে চল।

আট কিলোমিটার অতিক্রম করে এসেছি। এখন এক মনোরম উপত্যকায় এসে পড়লাম। জায়গাটির নাম - পানার। এই সমতল উপত্যকার মাঝখানে মাটির দেওয়াল আর খড়ের চালের একটা ঘর আছে।

সাগর থেকে রুদ্রনাথ দীর্ঘপথে এই একটি মাত্র আস্তানা।

দুপুর ১২টার মধ্যে এখানে পৌঁছতে না পারলে সেদিনকার মত এখানে থেকে গিয়ে পরের দিন রুদ্রনাথ যাত্রা করা উচিত। কেননা বিকালের দিকে আবহাওয়া সাধারণতঃ ভাল থাকে না।

মদ্‌মহেশ্বরের পথে রুদ্রনাথ ফেরৎ চারজন যাত্রীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। চারজনের মধ্যে দু'জন মহিলা। তাঁরা রুদ্রনাথে যাওয়া আসার পথে এখানে রাত্রিবাস করেছিলেন।

আমার সহযাত্রীদের দেখে তাঁরা বারবার বলে দিয়েছিলেন—আমরা যেন একদিনে পৌঁছবার দুঃসাহস না করি।

কিন্তু কেন—? এখন তো বেলা সাড়ে বারটা মাত্র। প্রায় অর্দ্ধেক রাস্তা এসে গেছি। সন্ধ্যার আগে নিশ্চয় বাকী অর্দ্ধেক পৌঁছানো যাবে। তা'ছাড়া শেষের পাঁচ কিলোমিটারে শুনেছি চড়াই উত্তরাই বিশেষ নেই। তবে ভয় পাবার কি আছে? অতএব চল এগিয়ে যাই।

হিমালয়ের এই হাঁটাপথে যার শরীর যত হাল্কা তার কষ্ট তত কম। বিশেষ করে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা অক্লেশে চলতে পারে।

অথচ তাদের জন্যই আমাদের বেশী চিন্তা। আমাদের বেলায়ও তাই। আমরা স্বামীস্ত্রী—মাঝে মাঝে থেমে নিঃশ্বাসটা স্বাভাবিক করে নিয়ে আবার এগুচ্ছি। অথচ ছেলেমেয়ে দু'টি সাথীদের সঙ্গে অনায়াসে এগিয়ে যাচ্ছে।

বেলা তিনটা নাগাদ ১২ কিলোমিটার অতিক্রম করলাম।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। হাওয়াও দিচ্ছে। সঙ্গে কুচি কুচি বরফ ভেসে এসে গায়ে পড়ছে।

এই পথে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটা কষ্টকর। বিপজ্জনকও বটে। কেননা জায়গায় জায়গায় পা রাখা যাচ্ছে না। পিছ্‌লে যাচ্ছে। বেশীর ভাগ পথে একপাশে খাদ তো থাকবেই। তবে এক্ষেত্রে একটা সুবিধা হচ্ছে—শেষের এই পথটুকু প্রায় সমতল। প্রশস্তও বটে। লাঠি হাতে চলতে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

আশে পাশে গাছপালা বিশেষ নেই। খানিকটা শুধু পাথর আর খানিকটা ঘাসের চাদরে মোড়া।

একটা জায়গায় বাঁক নিতেই ধনবাহাদুর দূরে ঘন বৃক্ষলতাচ্ছাদিত অনসূয়া গ্রাম দেখিয়ে দিল। দেখে মনে হয় দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই তর তর করে অনসূয়া নেমে যাওয়া যায়।

কিন্তু হায় রে, হিমালয়ের বুকে সোজা এক মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে কয়েক মাইল ধরে বেশ কয়েক হাজার ফুট চড়াই উতরাই যে ডিঙোতে হয় হিমালয়যাত্রী মাত্রেরই তা জানা আছে।

রুদ্রনাথের এই নতুন পথের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সাগরগ্রাম থেকে যাত্রা করে প্রথম দুই তৃতীয়াংশ পথ অবশ্য আর দশটা পাহাড়ী পথের সমগোত্রীয়। কিন্তু শেষ এক তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যেন আধখানা আংটার মত জড়িয়ে আছে। মনে হবে ঐ দূরে যেখানে পাহাড়টা শেষ, রাস্তাটাও বুঝি সেখানে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সে জায়গাটায় এলে নতুন আর একটা পাহাড়ের গায়ে আবার আংটার

মত জড়ানো পথ। রুদ্রনাথের মন্দির পর্যন্ত একই ধরণের পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করতে হবে।

শেষের দিকে পথ যেন আর ফুরোতে চায় না। আমাদের সকলের চলনেও ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেকটা টলতে টলতে চলেছি।

হঠাৎ সব অবসাদের পরিসমাপ্তি ঘটল।

একটা পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই তু'একখানা ঘরবাড়ীর মত আবছা দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় আমাদের সেই ঈপ্সিত দেবালয়।

অধীর আনন্দে সকলে চীৎকার করে উঠলাম। পরে শুনেছি, তার প্রতিধ্বনি পূজারীর কানেও পৌঁছেছিল এবং তিনি অধীর আগ্রহে মন্দিরের বাইরে এসে আমাদের দেখছিলেন।

দেখা যাচ্ছে। তবুও মাইলের হিসাবে এখনও পৌনে দু'কিলো মিটার। রাস্তা এবং আশেপাশে প্রায় সর্বত্র পেঁজা তুলার মত চাপ চাপ বরফ জমে আছে। তাছাড়া পথের এই অংশে মাটির ভাগ বেশী। অনেকটা গাঙ্গেয় পলিমাটির মত। তাই একটু বৃষ্টিতেই পথ বেশ পিচ্ছিল হয়ে ওঠে।

আনন্দের আতিশয্যে আমরা যত তাড়াতাড়ি পথ চলতে চাইছি ততই পা পিছলে পড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছে। তবুও অপরিসীম উৎসাহে এগিয়ে যাই।

তু'পাশে ঘাসের মধ্যে রঙ বেরঙের ছোট ছোট ফুল। প্রধানতঃ এই ফুলেই দেবতার পূজা হয়।

অবশেষে পরম প্রত্যাশার চরম প্রাপ্তি রুদ্রনাথের মন্দিরে পেঁীছে গেলাম।

রুদ্রনাথ পাহাড়ের উচ্চতা ১১৬৭০ ফুট। চারিদিকে বিস্তীর্ণ খোলা জায়গা। হিমেল হাওয়ায় শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। তাই পঞ্চকেদারের মধ্যে রুদ্রনাথের মন্দির সর্বাগ্রে বন্ধ হয়ে যায়। কার্তিকমাসের সংক্রান্তিতে। শীতের সময় পূজা হয়

গোপেশ্বরে। পূজার যাবতীয় ব্যবস্থা গোপেশ্বরের রাওয়ালই করে থাকেন।

রুদ্রনাথ। রুদ্রমূর্তি মহাদেব।

দৈত্যকুলাধিপতি অন্ধকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা মহর্ষি নারদের শরণাপন্ন হন। নারদের পরামর্শে দেবতারা কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করেন। দেবতাদের প্রতি অন্ধকের অত্যাচারের কাহিনী শুনে মহাদেব নিজেই তাকে বধ করার অঙ্গীকার করেন।

ওদিকে দেবর্ষি নারদের প্ররোচনায় অন্ধকদৈত্য মন্দার পুষ্পমালা সংগ্রহের মানসে দেবাদিদেব মহাদেবের আলয়ে।অর্থাৎ হিমালয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়।

সে সময়ে মহাদেব পার্বতীর সঙ্গে শৃঙ্গারে মগ্ন ছিলেন। সে অবস্থায় অন্ধকদৈত্যকে দেখে তিনি রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন এবং শূলাঘাতে তার প্রাণ সংহার করেন।

রুদ্রনাথের অধিষ্ঠান গুহামন্দিরে। মন্দিরের চূড়া বলে কিছু নেই বিরাট একখণ্ড পাথরের চাঁই। তার উপর সাদা পতাকা। বিশাল নীল আকাশের নীচে ঐ শ্বেতশুভ্র পতাকা যেন রুদ্রনাথের সম্মিলিত জ্যোতি শিখা।

দিগন্তে শ্রেণীবদ্ধ তুষার শিখর যেন সারিবদ্ধ শ্বেতহংস। পক্ষ বিস্তার করে বসে আছে।

পাহাড়ের মাথা থেকে একটু নীচে এই মন্দির। পাশে মন্দির সংলগ্ন দু'টি চালাঘর, পূজারী এবং তাঁর সহকারী থাকেন।

তার পাশে পাহাড়ের গায়ে পাথর দিয়ে সাজানো ছোট ছোট মন্দির। সর্বত্র শিব-মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত।

পাথরের কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। নত মস্তকে চৌকাঠ পেরিয়ে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলাম।

সন্ধ্যারতি সুরু হয়ে গেছে। স্তিমিত দীপশিখা। বিচিত্র পাহাড়ী ফুলের সমারোহ। ধূপধুনা, চন্দনের স্নিগ্ধ গন্ধ। পূজারীর কণ্ঠ নিঃসৃত

ভাব গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ। সর্বোপরি ধ্যানগম্ভীর হিমগিরির কোলে সহস্র বৈচিত্র্যের মাঝে এই মন্দিরের অবস্থান। সবকিছু মিলিয়ে অপূর্ব শিহরণ। অসীম আনন্দ। প্রগাঢ় শান্তি।

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি।—দেবাদিদেব, মহাদেব, তুমিই রুদ্রনাথ, তুমিই আশুতোষ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী মহেশ্বর,—তোমাকে শতকোটি প্রণাম।

—হে রুদ্রনাথ, হে সর্বসংহারক ভৈরব, তুমিই তো আশুতোষ। —শান্তি দাও প্রভু।—শান্তি দাও।

পূজারী প্রয়াগ দত্ত ভাট্। পরম নিষ্ঠাবান। বয়স বেশী নয়। পঁয়ত্রিশের নীচে, সহকারীরও একই বয়স।

পূজারীর পরণে আলখাল্লা। মাথায় পাগড়ী। কপালে চন্দন। আমাদের পূজার সব ব্যবস্থা তিনি করে দিলেন।

মন্দিরের এবং দেবতার মাহাত্ম্য তিনি বুঝিয়ে বলেন।—পঞ্চ-কেদারে মহাদেবের পাঁচ অংশের প্রকাশ। কেদারনাথ মদ্‌মহেশ্বর তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ ও কল্পেশ্বর। এই রুদ্রনাথ হচ্ছেন মুখারবিন্দ লিঙ্গ। লিঙ্গের উপরিভাগে মুখ। আগাগোড়া কালো শিলা।

নিখুঁত মুখের আকৃতি। শান্ত স্নিগ্ধ আশুতোষের করুণাঘন দৃষ্টি। দর্শনে দেহে মনে নেমে আসে পরম শান্তি।

এই গুহামন্দির অপ্রশস্ত হলেও বসার বা প্রদক্ষিণ করার কোন অসুবিধা হয় না।

লিঙ্গ পরিক্রমা সেরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। পূজারী শান্তিবারি সিঞ্চন করেন। কী অসীম আনন্দ। অপার শান্তি।

রাত্রে পূজারীর ঘরে আশ্রয় নিলাম। ঐ একটি মাত্র ঘরই কোন রকমে বাসোপযোগী আছে। বাকী ঘরখানা কয়েক জায়গায় ভেঙ্গে গেছে। তাতে রান্না খাওয়ার কাজ চলে। আমাদের সাথী দু'জন ওঘরেই থাকবে।

পূজারীর ঘরে মাঝখানে একটা ধুনি জ্বলে। তার একপাশে

আমাদের থাকার ব্যবস্থা হ'ল। কোন রকমে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকতে হবে। দু'জনের মত জায়গায় চারজনের ব্যবস্থা।

ধুনির আর এক পাশে পূজারী এবং তাঁর সহকারী আড়াআড়ি ভাবে থাকবেন। যাইহোক, তাঁদের সহৃদয় ব্যবস্থাতে আমাদের কোন অসুবিধা রইল না।

পথের দুর্গমতা হেতু রুদ্রনাথে যাত্রী সমাগম খুবই কম। তবে এখানে একটা কথা বলে রাখি,—রুদ্রনাথের পথের দুর্গমতা নিয়ে অনেকেই একটু বাড়িয়ে বলেন। অনেক বইতেও এ পথের ভয়াবহ বর্ণনা দেওয়া আছে। তাতে সাধারণ মানুষের মনে একটা অস্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার হয়। তাই অনেকেই প্রবল ইচ্ছা সত্বেও এই মহাতীর্থে আসতে সাহস পান না। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি,—সাগর হয়ে রুদ্রনাথের এই নতুন পথ কিছুমাত্র দুর্গম নয়। যাঁরা কেদারনাথ মদ্‌মহেশ্বর গেছেন তাঁরা অনায়াসে এখানে আসতে পারেন। বরং মদ্‌মহেশ্বরের চড়াই এর থেকেও কঠিন। তবে বাণতোলী থেকে মদ্‌মহেশ্বরের দূরত্বটা কম। মাত্র ৯/১০ কিলোমিটার।

রুদ্রনাথের পথে আর একটি সুবিধা মাঝপথে পানারের সেই চালাঘর খানা। যাঁরা আস্তে আস্তে যেতে চান তাঁরা রাত্রে সেখানে বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন রুদ্রনাথ পৌঁছতে পারবেন।

আমরা (১৫ বছরের মেয়ে, ১২ বছরের ছেলে, আমি এবং সহধর্মিনী) ভুলপথে ৩/৪ কিলোমিটার বাড়তি হেঁটেও সকাল ছ'টায় রওনা হয়ে সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে পৌঁছে গেছি।

তবে অনসূয়া থেকে কিংবা কল্পেশ্বর থেকে ডুমক্ হয়ে রুদ্রনাথের পথ তুলনায় দুর্গম সন্দেহ নাই। ওসব পথে স্থানীয় কিছু লোকজন ছাড়া আজকাল আর কেউ যাতায়াত করেন না।

অনসূয়া থেকে রুদ্রনাথের সেই পুরানো রাস্তাটা সংস্কার হচ্ছে।

শুনলাম আরও বছর দুই লাগবে। তখন সে রাস্তাও অনেক সহজ-সাধ্য হবে।

আমার ধারণা, সাগর থেকে রুদ্রনাথের এই নতুন রাস্তার আরও প্রচার বাড়লে রুদ্রনাথে যাত্রীসমাগম বাড়বেই।

রুদ্রনাথে থাকার অন্য ব্যবস্থা ও আছে। মন্দিরের বেশ কিছুটা নীচে একটা সমতল ভূখণ্ডের উপর পি, ডব্লু ডি দু'খানা টিনের ঘর করে রেখেছেন। যা'তে যাত্রীদের থাকার কোন অসুবিধা না হয়। কিন্তু দূরত্ব হেতু যাত্রীরা সেখানে থাকতে চান না।

মন্দিরের অনতিদূরে ২/৩ খানা অর্দ্ধভগ্ন শ্লেট পাথরের ঘর আছে। অতীতে ধর্মশালা হিসাবে ব্যবহৃত হত। আজও বিশেষ পূজা পার্বণে অথবা শ্রাবণী পূর্ণিমায় পাহাড়ী যাত্রীরা যখন দলবেঁধে পূজা দিতে আসে তখন তারা ওখানে আশ্রয় নেয়।

এখানে জলের তেমন কোন অসুবিধা নেই। তবে সংগ্রহ করতে হলে কিছুদূর নীচে নেমে যেতে হবে।

মন্দির থেকে প্রায় এক দেড় কিলোমিটার খাড়া উতরাই পথে জঙ্গলের মধ্যে এক কুণ্ড আছে। এই কুণ্ড থেকেই বৈতরণী নদীর উৎপত্তি। তাই নামও হয়েছে বৈতরণী কুণ্ড।

কুণ্ডের দেওয়াল সংলগ্ন অনন্তশয্যায় শায়িত নারায়ণ মূর্তি। পদতলে লক্ষ্মী। নাভিকমলে চতুরাণন ব্রহ্মা।

কুণ্ডের পবিত্র জলে অনেকেই স্নান তর্পণাদি করে থাকেন।

রুদ্রনাথের স্নান এবং পূজার জল আসে স্বর্গদ্বার থেকে। মন্দির ছাড়িয়ে পাহাড়ের উপর এই স্বর্গদ্বার। সেখানে পঞ্চগঙ্গা নামে পাঁচটি ক্ষীণ জলধারা সতত প্রবহমান।

সকালে পূজারীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও শয্যা ত্যাগ করলাম। মুখ হাত ধুয়ে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নি। কেননা দেবতার অভিষেক পূজা দেখতে হবে।

পুরোহিত প্রথমে পঞ্চগঙ্গার জলে দেবতার স্নান করান। তারপর

বেশভূষা পরাবার পালা। বস্ত্র, চন্দন, ফুলের মালা। মাথায় রাজকীয় মুকুট। মুখে পিতলের মুখোশ। একজোড়া প্রকাণ্ড গোঁফ। ভ্রুকুটিপূর্ণ অভিব্যক্তি। সোজা হয়ে বাঁদিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে থাকেন। দৃষ্টিতে রোষবহ্নি সুদূর প্রসারিত। মনে হয় কোন মদ গর্বীর ঔদ্ধত্য দেখে কুপিত।

আরও একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। কোন একসময় ধ্যানমগ্ন রুদ্রনাথের তপোভঙ্গ হয়। তখন দেখেন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কয়েকটা মেষশাবক নীচে জঙ্গলের দিকে নেমে যাচ্ছে। সঙ্গে মেষ কিংবা মেষ পালক কেউ নেই। তিনি ঘাড় বেঁকিয়ে শাবকগুলির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন। নীচে জঙ্গলের মধ্যে যে হিংস্রজন্তুর বাস। সে সময় মেষ পালকের আগমনে তিনি নিজেকে প্রস্তরে পরিণত করেন। কারণ তিনি তাকে দর্শন দিতে অনিচ্ছুক। সেই থেকে মূর্তি ঘাড় বেঁকিয়ে বাঁদিকে হেলে আছে।

সে দিন থেকে নাকি রুদ্রনাথের পাহাড়ে পশুচারণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

স্নানান্তে অভিষেক পূজা আরম্ভ হ'ল। তারপর আরতি।

আমরা একটা কম্বল পেতে বসে ভগবানের অর্চনা দেখি। পূজা শেষে প্রয়াগদত্তজী আমাদের অঞ্জলি দেওয়ালেন। বহুদিনের স্বপ্ন সার্থক হ'ল।

নির্বিঘ্নমনে পরম শান্তিতে ভগবান রুদ্রনাথের পূজা দেখলাম। মন আনন্দে ভরে গেল। মন্দির, মূর্তি, পুরোহিত সব মিলে একাকার। যেন একটা মাত্র সত্ত্বা। দেবাদিবেব মহাদেবের ভাবগম্ভীর বিকাশ।

চারিদিকে প্রকৃতির অপরিসীম বিস্ময়। দিগন্তে শুভ্র গিরি শিখর। মাথার উপর সূর্য্যকরোজ্জ্বল নির্মল আকাশ। পদপ্রান্তে সবুজ বনানীর কোলে বিচিত্র ফুলের মেলা। প্রকৃতির কী অপরিসীম বিশ্বজোড়া রূপ।

—হে মহেশ্বর, এতো তোমারই বহিঃ প্রকাশ। বিশ্বজোড়া যে তোমার আসন পাতা।

গোপেশ্বর—চামোলী—পিপলকোটী

॥ ১১ ॥

এবার ফেরার পালা।

—জয় বাবা রুদ্রনাথ। পূজারী প্রয়াগদত্তজী ঠাকুরের গলার একগাছা মালা আমার হাতে দিয়ে সকলকে আশীর্বাদ করলেন।

ভগবানের অশেষ করুণা। অমোদের যাত্রা সর্বতোভাবে সার্থক। এই মহাতীর্থপথে কারও বিন্দুমাত্র কোন কষ্ট হয়নি। প্রকৃতিও ছিল যথেষ্ট সদয়।

ফেরার পথে বারে বারে মন্দিরের দিকে ফিরে তাকাই। যতক্ষণ দৃষ্টি গোচর হয়। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই যেন এই পুণ্যক্ষেত্রে আবার আসতে পারি।

এই পথেই এসেছি, তবুও ফেরার পথে সব যেন নতুন মনে হচ্ছে। হিমালয়ের বুকে এটাই বিস্ময়। প্রতিটি দিন নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে উদয় হয়। বিগত দিনের সব স্মৃতি নতুন আলোয় নবরূপে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠে।

ক্রমশঃ সাগরের দিকে নেমে যাচ্ছ। সন্ধ্যার আগে গোপেশ্বরে পৌঁছানো চাই। সেখানে যতীনদাকে খুঁজে বার করতে হবে।

পুত্র বেশ আগে আগেই চলেছে। হঠাৎ দেখি—একটা গাছের বাকল ধরে টানাটানি করছে। অতি সন্তর্পণে গাছের কাণ্ড থেকে বাকলটা ছাড়িয়ে নিল।—আরে, এযে ভূর্জপত্র! যাবার সময় ধন বাহাদুর নাকি ওকে দেখিয়ে দিয়েছিল। যাই হোক, শ্রীমান ওটা সযত্নে বেঁধে নিল। কলকাতায় গিয়ে সকলকে দেখাতে হবে তো।

প্রথমতঃ রুদ্রনাথের নিদর্শন। দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃতির আদিম পরিচয় পত্র।

দুপুরের দিকে সামান্য আহার সেরে নিলাম। সকালে বেরুবার আগে সাথীরা ক'খানা পরটা ভেজে নিয়েছিল। ঝাল নুন্‌ সহযোগে সেগুলির সদগতি হল।

বিকাল চারটা নাগাদ সাগরে পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে পাকা রাস্তা ধরে গোপেশ্বর। মাত্র চার কিলোমিটার পথ। বাস কিংবা অন্য যানবাহন কচিৎ মেলে। অতএব কোনকিছুর ভরসা না করে হাঁটতে লাগলাম। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গোপেশ্বরের প্রবেশপথে উপস্থিত হলাম।

এবার সেই হিল ভিউ হোটেলটার খবর নিতে হবে। সেখানেই যতীনদার থাকবার কথা। খবর নিয়ে জানলাম, শহরটা আরও এক কিলোমিটার নীচে।

এখন প্রধান বাস রাস্তার উপর যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার আশে পাশে অনেক নতুন নতুন বিলাস বহুল বাড়ীঘর হয়েছে। তবে পুরানো আমলের গোপেশ্বর শহর সেই নীচে। আমাদের সেখানেই যেতে হবে। দেখে মনে হয় ঐ তো নীচে, দেখা যাচ্ছে। কিন্তু রাস্তা ধরে ঘুরে যেতে বেশ সময় লাগে।

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। সারা গোপেশ্বর আলোয় আলোময়। আলোর পরিধি থেকেই বোঝা যায় শহরটা কতখানি বিস্তৃত।

গোপেশ্বর, চামোলি জেলার সদর কার্যালয়। উচ্চতা ৪০০০ ফুট। নতুন রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, খেলার মাঠ ইত্যাদি গোপেশ্বরকে আধুনিক শহরের স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। তবে এ হেন উন্নত শহরের শৌচাগারের দুর্দশা কলকাতার নোংরা বস্তীর জঘন্য ব্যবস্থাকেও হার মানায়। নতুন কয়েকটা বাড়ী, অফিস কিংবা সরকারী আবাস ছাড়া কোথাও শৌচাগার নেই। পাহাড়ের ঢালে নালানর্দমা কিংবা ঝোপঝাড়ের মধ্যেই প্রাত্যহিক কাজকর্ম সারতে হয়।

নীচে বাজারের কাছে বাস স্ট্যাণ্ডে যতীনদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেখেই কী আনন্দ। দুর্গম পথে ছেলেমেয়ে নিয়ে গেছি—। আমাদের কথা ভেবে সারারাত নাকি ঘুমোতেই পারেন নি।

মেয়ে বলে উঠল—আগে তোমার হোটেলে চল জেঠু।

—আমার হোটেলে আমিই বাস্তুহারা, তোরা কোথায় যাবি? তাছাড়া ওখানে বাথরুম পায়খানা বলে কিছু নেই।

—সে কি? হিল ভিউ হোটেল—, কত আধুনিক নাম, তার এই অবস্থা?

—ওটার নাম আমি পাল্টে দিয়েছি—ইল্ ভিউ হোটেল। এত ক্লান্তির মধ্যেও সকলে হেসে উঠি।

গোপেশ্বরের ধর্মীয় প্রধান আকর্ষণ গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির শহরের মধ্যেই। মন্দির অঙ্গনে অনেক দেবদেবীর মূর্তি। মন্দির দ্বারে বিরাট এক ত্রিশূলের অবস্থান। শুধু স্পর্শেই নাকি কে পাপী আর কে পুণ্যাত্মা বোঝা যায়। শীতকালে এই গোপেশ্বরের মন্দিরেই রুদ্রনাথের পূজা হয়ে থাকে।

দেবগণের প্ররোচনায় মদন পঞ্চশরে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করলেন। মহাদেবের রোষবহ্নিতে মদনও ভস্মীভূত হল। কিন্তু পঞ্চশরে কামাবিষ্ট মহাদেব গিরিরাজ কন্যা পার্বতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। পরে অবশ্য মহাদেবের অনুগ্রহে মদন পুনর্জীবন লাভ করে। এই সেই ভূমি যেখানে মহাদেব মদনকে ভস্মীভূত করেছিলেন।

বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে একটা হোটেলে থাকার বন্দোবস্ত হ'ল। হোটেল বললে বাড়িয়ে বলা হয়। কোন রকম রাতের আস্তানা। এতবড় শহরে একটা ভাল হোটেল নেই। সরকারী গেষ্ট হাউস অবশ্য আছে। তবে তাতে ঠাঁই মেলা দুস্কর। বছরের প্রায় সব সময় সরকারী আমলাদের দখলে থাকে। যাই হোক একটা রাত বৈ তো নয়! কাল সকালেই তো কল্পেশ্বরের পথে রওনা হব।

সকাল ছ'টায় বাস ছাড়ল। বাস হৃষিকেশ যাবে। আমরা চামৌলী নেমে যাব। তারপর যোশীমঠ কিম্বা বদ্রীনারায়ণের বাসে হেলাং। কল্পেশ্বরের প্রবেশপথ। গোপেশ্বর থেকে কোন বাস সরাসরি উপরদিকে যোশীমঠ কিংবা বদ্রীনারায়ণের দিকে যায় না।

অল্পসময়ের মধ্যে চামৌলী পেঁাছে গেলাম। বেশ বড় জায়গা। জেলাশহর। সহর জীবনের সব রকম সুখ সুবিধা এখানে পাওয়া যায়।

বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে পাহাড়ের মাথায় পাকা রাস্তা উঠে গেছে। সেখানে প্রচুর মনোরম ঘরবাড়ী। সব সরকারী আওতায়। অফিস অথবা সরকারী কর্মচারীদের বাসস্থান। অলকানন্দার তীরে এই শহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়।

বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে একটু দূরে ডান দিকে বেশ বড় বাজার। সেখান থেকে পথের জন্য কিছু রসদ সংগ্রহ করে নিলাম।

চামৌলীর পথঘাট, বাজার সব ঝকঝকে তকতকে। মিউনিসিপালিটি বেশ তৎপর। বাজারের বিপরীত দিকে রাস্তা ধরে এগুলে, ডান দিকে নীচে সারিবদ্ধ শৌচাগার। বেশ পরিস্কার। জলেরও ভাল বন্দোবস্ত আছে। দেখে মনে হ'ল গাড়োয়ালের প্রধান ব্যতিক্রম।

আজকাল একটা কষ্টের লাঘব হয়েছে। আগে কল্পেশ্বর যেতে হলে পারমিট লাগত।

সংগ্রহ করতে হ'ত চামৌলী কিংবা যোশীমঠ থেকে। এখন আর পারমিট লাগে না।

ন'টা নাগাদ বাসে উঠলাম। বদ্রীনারায়ণের বাস। আমরা হেলাং নেমে যাব। প্রথমে পিপলকোটী তারপর হেলাং। পিপলকোটী পেঁাছতেই মনের দর্পণে অতীতের এক স্মৃতি ফুটে উঠল।

১৯৭০ সাল।

অলকানন্দার ভয়াবহ বন্যায় এসব এলাকায় বিপর্যয় নেমে এসেছিল। বহু পথঘাট ঘরবাড়ী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। স্রোতে ভেসে যায় অসংখ্য জীবন।

সেবছর পূজোয় আজকের আমরাই এ পথে এসেছিলাম। বদ্রী-নারায়ণ দর্শনে। সেবার বন্ধু যতীনদা ছিলেন না, আমরা চারজন ছাড়া দলে ছিল—মা, ছোটভাই তাপস আর আমার হিমালয় প্রেমিক বন্ধু সুনীল দত্ত ওরফে উদাসীবাবা।

সেবারে ঐ বিধ্বংসী বন্যায় বহু জায়গায় রাস্তা ভেঙে যায়। কোন-রকমে যানবাহন চলার মত সাময়িক মেরামত হয়েছে। তবে পিপল-কোটী থেকে হেলাং পর্যন্ত রাস্তার কোন চিহ্ন নেই। যাত্রীসমাগম ছিল না বললেই চলে। রাস্তার এতখানি দুরবস্থা জানা থাকলে আমরাও হয়ত এপথে আসতাম না।

বদ্রীনাথের রাস্তা দক্ষতার সঙ্গে দ্রুত মেরামত করা হয়। কেন না সামরিক প্রয়োজনে এ পথের গুরুত্ব অপরিসীম। অনেকটা সেই ভরসাতেই ঐ দুর্যোগের বছরেও এপথে এসেছিলাম।

কেদার থেকে ফেরবার পথে রুদ্রপ্রয়াগে এসে নামলাম। এখান থেকে বদ্রীনারায়ণের বাস ধরতে হবে।

হঠাৎ শুনি কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে,—আরে! সুশীলদা আপনি কোত্থেকে?

আপনি একা, না সঙ্গে কেউ আছে?

—আমি একা। বদ্রীনারায়ণ গিয়েছিলাম। তুমি কোথায় যাচ্ছ?

—বদ্রীনারায়ণ।

ছেলে মেয়ে আর বৃদ্ধা মাকে দেখে সুশীলদা মনে মনে কি যেন ভাবছে। অবশেষে ভাবনার কারণটা বলেই ফেলল,—নারায়ণ দর্শনে যাচ্ছ, বাধা দেওয়া উচিত হবে না। তবে রাস্তা খুব খারাপ।

আর কোন যাত্রী ও নেই। আমি যাতায়াতে একজন যাত্রীও পাইনি।

—এখন কোথায় যাচ্ছেন?

—কেদারনাথে যাব ইচ্ছা ছিল। তবে শরীরের যা অবস্থা ভরসা পাচ্ছি না। তাই সোজা হৃষিকেশ চলে যাব ভাবছি।

ততক্ষণে আমাদের বাস এসে গেল। পথের বিশেষ খবরাখবর নেওয়া আর হল না।

দুপুর ১টা নাগাদ আমরা রুদ্রপ্রয়াগ ছাড়লাম। বাসের মধ্যে জনাকুড়ি লোক।

জায়গায় জায়গায় রাস্তা খুব খারাপ, সেখানে অতি সন্তর্পণে বাস এগোচ্ছে।

বিকেল চারটা নাগাদ বাস হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। কী ব্যাপার?
—না, ইঞ্জিন বিগড়েছে। ড্রাইভার আর ক্লিনার ইঞ্জিনের রোগ সারাতে লেগে গেল। এদিকে আমরাও বাস থেকে নেমে পড়লাম। ঠায় বসে থাকার হাত থেকে একটু রেহাই। বাসটা অলকনন্দার খাদের দিকেই দাঁড়িয়েছে। অন্য যানবাহন সহজে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

জায়গাটা একেবারে নির্জন। একদিকে জঙ্গলাকীর্ণ খাড়া পাহাড়। অন্যদিকে অনেক নীচে অলকানন্দার প্রবাহ। শুনলাম ২।৩ মাইলের মধ্যে কোন বসতি নেই। চামৌলীর দূরত্ব এখান থেকে বার মাইল।

—কী ব্যাপার! এক ঘণ্টা হতে চলল এখনও গাড়ী ঠিক হল না?

ড্রাইভার কাজ করতে করতে নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল—চেষ্টা তো করছি। তবে আশা বিশেষ নেই। আপনারা বরং এগিয়ে যান।

—এগিয়ে যাব? কোথায়? জঙ্গলাকীর্ণ নির্জন পথ। অন্ধকার হয়ে আসছে। মাথায় যেন বাজ পড়ল। বাসে আমরা ছাড়া বাকী

এখানকার স্থানীয় লোক। দু চার জন হাঁটা আরম্ভ করল। বাকী কয়েকজন বাসের মধ্যেই রাত কাটাবে মনস্থ করল।

আমরা কি করব? সঙ্গে খাবার দাবার কিছু নেই। তাছাড়া বাসের মধ্যে সারারাত বসে কাটানো,—। মনে মনে খানিকটা শঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

নির্জনপথ, দু'একখানা সামরিক ট্রাক যাতায়াত করছে। হঠাৎ ছোটভাই বলে উঠল—আচ্ছা, এদের অনুরোধ করলে হয় না? ট্রাকে করে আমাদের একটু এগিয়ে দেবে। কথাটা আমার মনে ধরল।

সঙ্গে সঙ্গে হর্ণ্ ও শোনা গেল। ঐতো একটা ট্রাক নীচে থেকে আসছে। একরকম রাস্তার মাঝখানে হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ট্রাকটা কাছে এসে থামল। আমি ড্রাইভারের পাশে পা দানিতে উঠে দাঁড়ালাম। ড্রাইভারের পাশের সীটে একজন সামরিক অফিসার। দুজনেই সম্ভবত দক্ষিণ ভারতীয়। আমি বিশেষ অনুনয় করে আমাদের একটু চামৌলী পৌঁছে দিতে বললাম।

দু'জন নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করল। পরে অফিসারটি আমাকে ইংরাজীতে বলল—দেখুন, মিলিটারী ট্রাকে কোন সিভিলি-য়ান বিশেষ করে মহিলা নিয়ে যাওয়া বেআইনি।

আমি মরিয়া হয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলাম—আমরা সুদূর বাংলা থেকে এখানে এসেছি। সঙ্গে নারী, শিশু, বৃদ্ধা। রাত্রির অন্ধকারে নির্জন পাহাড়ীপথে অভুক্ত অবস্থায় আপনাদের সাহায্য ভিক্ষা করছি। জনগণের যে কোন বিপদে আপনারা সব সময় এগিয়ে আসেন,—সে ভরসায় আপনার কাছে এই অনুরোধটুকু রাখছি।

দু'জনে আবার কী যেন বলাবলি করল। তারপর অফিসারটি বলল—যান, মালপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন।

—তবে মাথা নিচু করে বসে থাকবেন। বাইরে থেকে যেন দেখা না যায়।

ধড়ে প্রাণ এল। ট্রাকে উঠতে গিয়ে সমস্যায় পড়লাম। বিশেষ

করে মাকে নিয়ে। একে ভারী মানুষ, তার উপর ট্রাকের ডালা বেশ উঁচু। কোন রকমে ডালার উপর উঠে ভিতরে লাফিয়ে পড়তে হবে।

যাক গে, মালপত্র নিয়ে কোন রকমে উঠে পড়লাম। মাকে অতিকষ্টে টেনে ডালার উপর তুলে ভিতর থেকে ধরে নামিয়ে নিলাম।

সশব্দে ট্রাক ছুটছে। মুহুর্মুহু তীব্র ঝাঁকানি। সবাই ভিতরে বসে গায়ে গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে চলেছি। শারীরিক কষ্ট, দুশ্চিন্তা, ভয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না।

বোধ হয় চামোলী এসে গেছি। বহুদূর বিস্তৃত আলোর মেলা, একসময় অফিসার ভদ্রলোক বললেন—গাড়ী পিপলকোটি যাবে। আপনারা ইচ্ছা করলে পিপলকোটি পর্যন্ত যেতে পারেন। আমি সোৎসাহে বললাম—সেতো খুব ভাল কথা। অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া যাবে।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ পিপলকোটি পৌঁছে গেলাম। এতক্ষণ যে পথে এসেছি, চোখে না দেখলেও ঝাঁকানিতেই পথের অবস্থা মালুম হয়ে গেছে। যাকগে নারায়ণ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।

মালপত্র নিয়ে কালীকমলীর ধর্মশালায় উঠে এলাম। বেশ চমৎকার ব্যবস্থা। ঘরের মধ্যে মোটা সতরঞ্চি পাতা। তার উপর দড়ির খাটিয়া। সবশেষে নিশ্চিন্ত হলাম বাথরুম আর পায়খানা দেখে।

রাত অনেক হয়েছে। মালপত্র রেখে সবাই খেতে গেলাম। ধর্মশালার সামনেই সারি সারি হোটেল আর চা জলখাবারের দোকান। খাবার দাবারও বেশ ভাল পাওয়া যায়। হৃষিকেশ ছাড়ার পর এত ভাল খাওয়া কোথাও জোটেনি।

সকাল হতেই আবার যাত্রার তোড়জোড় সুরু হল। শুনলাম, এখান থেকে হেলাং পর্য্যন্ত হেঁটে যেতে হবে। যাই হোক দু'জন কুলী

আর মা'র জন্য একজন জোয়ান কাণ্ডিওয়ালা যোগাড় করে যাত্রা সুরু করলাম।

পিপলকোটি থেকে মাইলখানেক রাস্তা মোটামুটি ভাল। তারপর সুরু হল পাহাড় ডিঙানো। বিপজ্জনক চড়াই উতরাই। একেবারে পাহাড়ের গোড়া থেকে চড়াইপথে পাহাড়ের মাথায়। আবার উতরাই পথে একেবারে পাহাড়ের গোড়ায়, অলকানন্দার সমতলে।

সামরিক বাহিনীর জোয়ানরা ঘোড়া বা খচ্চরের পিঠে মালপত্র নিয়ে দলে দলে এপথ দিয়ে চলেছে। তাদের পায়ের দাগ ধরে আমরাও চলেছি।

আমরা ছাড়া যাত্রী আর কেউ নেই। সামরিক বাহিনীর লোকেরা বারে বারে আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা জিজ্ঞাসা করে। প্রয়োজনে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। জোয়ানদের প্রতি আমাদের মন ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে।

মাঝপথে একটা জায়গায় চরম বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেলাম। খাড়া চড়াই পথে উঠছি। পাহাড়ের মাথায় উঠতে আর একটুখানি বাকী। আমি সকলের পিছনে। আমার ঠিক আগে মাকে কাঁধে নিয়ে কাণ্ডিওয়ালা চলেছে।

হঠাৎ কাণ্ডিওয়ালার চীৎকারে উপর দিকে তাকাই। চোখ পড়তেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। কাণ্ডিওয়ালা পা স্লিপ্ করে পাহাড়ের গায়ে বুক রেখে ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে আসছে। বুকে পিঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা কাণ্ডিটা কিন্তু শক্ত হাতে ধরে আছে। বেচারা শত চেষ্টা করেও পা দিয়ে আটকাতে পারছে না।—সর্বনাশ! এবার আমাকে শুদ্ধ নিয়ে নীচে গড়িয়ে পড়বে।

রাখে হরি মারে কে! হাতের কাছে একটা হাতখানেক লম্বা চারাগাছ নজরে পড়ল। ডান হাতে তার গোড়াটা শক্ত করে চেপে ধরলাম। আর পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে শক্ত করে মাটি কামড়ে দাঁড়ালাম। যেই কাছে এল, অমনি বাঁহাত দিয়ে কাণ্ডিওয়ালার

পায়ের গোড়ালিটা আলতোভাবে ঠেলে ধরলাম। তাতেই কাজ হ'ল। ততক্ষণ সেও পা রাখার জায়গা করে নিল।

ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে, ঐটুকু একটা চারাগাছ কী করে অতখানি টান সহ্য করল।

যাই হোক নারায়ণের কৃপায় সে যাত্রা বেঁচে গেলাম। উঃ, পথের কি অবস্থা! তখনও অলকানন্দার তাণ্ডবের নিদর্শন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে দেখতে পেলাম।—ঐতো লোহার প্রকাণ্ড সেই বেলাকুচি ব্রিজটা, ভাঙ্গা দেশলাইয়ের খোলের মত অলকানন্দার বুকের উপর দুমড়ে পড়ে আছে। তবে মেরামতের কাজ পুরোদমে চলছে। মাসেকের মধ্যে নাকি শেষ হবার আশা আছে। যাই হোক, অতিকষ্টে বেলা দুটো নাগাদ্ হেলাং পৌছে গেলাম।

হেলাং—উর্গম—কল্পেশ্বর

॥ ১২ ॥

পিপলকোটি থেকে বাস ছাড়ল। সকলেই উৎসুক হয়ে সেবারের সেই হাঁটা পথের কোন হদিস্ পাই কিনা দেখছি। কিন্তু না। কিছুই বুঝা গেল না। অতীতের সেই পথের স্মৃতি শুধু স্মৃতিপটেই অক্ষয় হয়ে রইল।

সাড়ে এগারটা নাগাদ হেলাং পৌঁছে গেলাম। রাস্তার ধারে অনেকগুলি দোকান ঘর। হোটেল বলে কিছু নেই। তবে নিত্য ব্যবহারের সব কিছু পাওয়া যায়।

দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিতে হবে। রাস্তার পাশেই উমেদ্ সিং এর চটি। চা বিস্কুট পাকৌড়া পাওয়া যায়। হুকুম হলে ভাত, ডাল, ভাজি তরকারী সব মেলে। আরও কয়েকটা দোকানে খাবারের খোঁজ করেছিলাম। কিন্তু কেউ রান্না করে দিতে রাজী হয় নি। একমাত্র এই উমেদ সিং ছাড়া। স্থানীয় কিছু লোককেও তার ওখানে খেতে দেখলাম।

উমেদ সিংকে আমাদের জন্য খাবার তৈরী করতে বললাম। আরও বললাম, একটু তাড়াতাড়ি করতে। কেননা আমরা একটু পরেই কল্পেশ্বরের পথে রওনা হব।

আমরা কল্পেশ্বর দর্শনে যাব শুনে, উমেদ সিং খুব খুশী। হেসে বললে,—আপনারা নিশ্চয় উর্গম-এ রাত কাটাবেন। আমার বাড়ীও উর্গমে। কোন অসুবিধা হলে আমার বাড়ী চলে যাবেন। আমার নাম বললেই গাঁয়ের লোক দেখিয়ে দেবে।

পথের কথা জিজ্ঞাসা করতেই বললে,—খুব ভাল রাস্তা। প্রথমেই যা একটু চড়াই। তারপর প্রায় সবটাই সমতল। কোন

চিন্তা করবেন না। এখন আপনারা নিশ্চিন্তে স্নান খাওয়া করুন। এই রাস্তা ধরে ডান দিকে একটু এগিয়ে গেলেই জলের কল। প্রচুর জল।

সত্যই চমৎকার সুযোগ। গত তিনদিন স্নান হয়নি। তাছাড়া এখন বেশ গরমও লাগছে।

হেলাং। আগে নাম ছিল কুমার চটি। এই হেলাং চটির কাছ থেকেই একটা রাস্তা নীচের দিকে অলকানন্দার পুল পর্য্যন্ত নেমে গেছে।

নতুন লোহার পুল। আগে ছিল দড়ির। পুল থেকে অলকানন্দার শোভা অতি মনোরম। দুরন্ত বেগে জলপ্রবাহ বয়ে চলেছে। কী প্রচণ্ড গর্জন।

ওপারের পাহাড় থেকেও একটা জলধারা সবেগে অলকানন্দায় এসে পড়েছে। নাম কল্পগঙ্গা।

পুল পার হয়ে আমরা কল্পগঙ্গার ধার ধরেই চলেছি। সরু হাঁটা-পথ। খানিকটা এগুলেই চড়াই শুরু। এখান থেকে জঙ্গলেরও শুরু। তবে খুব ঘন নয়। পাইন-এর বন। গাছগুলি সোজা দাঁড়িয়ে আছে। উপরে পাতার ছাতা। নীচের ছায়াপথ ধরে আমরা চলেছি।

কল্পগঙ্গা ডান পাশে অনেক নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। চড়াইপথে কোন ঝর্ণা নেই। তবে পথের স্নিগ্ধতায় পিপাসা তেমন পীড়া দেয় না।

ঝরা পাতায় ঢাকা ছায়াঘেরা পথ। মৃদুমন্দ বাতাসে ভেসে আসা পাইনের সুস্নিগ্ধ সুবাস। চারিদিকে ছড়ানো পাহাড়ীফুলের বাহার। মনকে আনন্দে ভরিয়ে তুলে। ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়।

কল্পগঙ্গার দুরন্ত জলধারা ডানদিকে রেখে আমরা চড়াই ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছি। পথে যেতে যেতে অনেক লোকের দেখা মিলছে। উপরে যে বেশ বসতি আছে বুঝা যাচ্ছে।

বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ আমরা একটা গ্রামে এসে পড়লাম। নাম সাল্‌মা। বহুদূর ব্যাপী সমতল ক্ষেত্র। গ্রামের মধ্যে ঘরবাড়ী অনেক। চাষ আবাদের অবস্থাও মোটামুটি ভাল। তবে জলের খুব কষ্ট। বছরের বেশীর ভাগ সময় দূরের ঝর্ণার জলের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

কল্পেশ্বরের যাত্রী শুনে গ্রামের লোক একটু আশ্চর্য্য হয়। খুশীও হয়। কেননা দূরের যাত্রী কল্পেশ্বরে বড় একটা কেউ আসে না।

গ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলি। প্রতিটি বাড়ীর আনাচে কানাচে সবুজের সমারোহ। বহু রকমের শাকসব্জী, আনাজ, ফলমূল।

এখান থেকে রাস্তা প্রায় সবটাই সমতল। চড়াই উত্তরাই থাকলেও অতি সামান্য। এ গ্রামটা যেখানে শেষ হয়েছে তারপর থেকে খানিকটা জঙ্গলের পথ। কিছুদূর গেলে আবার খোলা মাঠ।

উৎসাহভরে এগিয়ে চলি। পানীয় জল ফুরিয়ে এসেছে। অথচ জলের কোন চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি না। লোকমুখে জানতে পারলাম আর একটু এগোলেই পঞ্চধারা। এ এলাকার প্রধান জলকেন্দ্র।

সমতল মেঠো রাস্তা দিয়ে চলেছি। পিছন থেকে ছুটে আসার শব্দে ফিরে তাকাই। দেখি একটা যুবতী মেয়ে পাশের একটা উঁচু টিলা থেকে দৌড়ে নেমে আসছে। পরণে নতুন পোষাক। টান করে শাড়িপরা। ঢিলা জামা গায়ে। হাতে বাহারি কাচের চুড়ি। পায়ে রবারের জুতো।

নতুন লোক দেখে লজ্জায় দাঁড়িয়ে পড়ে। আড়চোখে তাকায়। আমরা যেচে আলাপ করি।

নাম পার্বতী। মাত্র সাতদিন আগে বিয়ে হয়েছে। স্বামী যোশীমঠে কোন এক কোম্পানীতে পোর্টারের চাকরী করে। বাপের বাড়ী গোচারণ। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে চামোলী যাবার পথে বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ। কথায় কথায় এও বলল—বড়ভাই চোদ্দ ক্লাসে পড়ে।

—এদিকে কোথায় যাচ্ছ?

দূরের ঐ মাঠ হাত দিয়ে দেখায়। মাঠে কিছু শুকনো কাঠ রাখা আছে। আনতে যাচ্ছে। কী সুন্দর অনাড়ম্বর পাহাড়ী জীবন! সাতদিনের নববধূ এরই মধ্যে নতুন সংসারের হাল ধরে নিয়েছে। ভাবতেও অবাক লাগে। অলকানন্দার তীরে গোচারণের পাহাড় ঘেরা সমতলে আশৈশব লালিত একটা মেয়ে কত সহজে কল্পগঙ্গার ধারে এই ছোট্ট গাঁয়ে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে।

পঞ্চধারায় পৌঁছে গেলাম। এখানে ঝর্ণার ধারাকে বাঁধিয়ে পাঁচটা মুখ দিয়ে পাঁচটা ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে। বছরের সব সময় এখানে জল থাকে। আশে পাশে গাঁয়ের লোকেরা এখান থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে।

মোড় ঘুরতেই চোখের সামনে দেখা দেয় বিরাট এক উপত্যকা। উর্গম গ্রাম। সারি সারি ঘরবাড়ি। চারিদিকে ধাপে ধাপে চাষের জমি। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ঝর্ণার ধারাকে কাজের সুবিধার জন্য বিভিন্ন দিকে বইয়ে দেওয়া হয়েছে।

ক্রমশঃ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করছি। চারিদিকে সবুজ আর সবুজ। পথের ধারে ঢালু পাহাড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে অগণিত গরু ছাগল ভেড়া। ঘরে বাইরে সবাই কর্মচঞ্চল। কেউ বা ক্ষেত-খামারে, কেউ বা ঘরে-উঠোনে। চারিদিকে যেন পূর্ণ লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করছে। এ যাত্রায় এ রকম সমৃদ্ধ গ্রাম নজরে পড়েনি।

সন্ধ্যা হতে আর বেশী দেরী নেই। তার আগে আমাদের আস্তানা ঠিক করে নিতে হবে। বন্ধু লক্ষ্মীনারায়ণ দাস বলে দিয়েছিল—গ্রামের মোড়ল ভগবান সিং-এর সঙ্গে দেখা করলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ঠিক আছে, ঐ যে দু তিন জন লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছে, ওদের কারও কাছে জিজ্ঞাসা করে নেব।

—একি! চেনা লোকের মত সম্বোধন করে ওরাই যে এগিয়ে আসছে।

ওদের মধ্যে একজন বললে—আপনাদের খবর আমি আগেই পেয়ে গেছি। পাশের লোকটাকে দেখিয়ে বললে—এই অবতার সিং খবর দিয়েছে

আপনারা যখন উমেদের দোকানে খাচ্ছিলেন তখন সে ওখানে ছিল। উমেদও এ গাঁয়ের ছেলে। বড় ভাল ছেলে। এই অবতারও গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী। আমার সহকারী।

—আপনার নাম কি তবে ভগবান সিং ?

—হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন। আমিই ভাওয়ান সিং। চলুন, আগে আপনাদের সব ব্যবস্থা করে দি। পরে বসে কথা বলব।

গ্রামের স্কুল বাড়ীতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হ'ল। প্রাইমারী স্কুল। মাটির ঘর। স্লেট পাথরের ছাউনি। চারখানা মাত্র ঘর। সামনে টানা বারান্দা। তারই একখানা ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হ'ল। পাশের ঘরে রান্না হবে। সাথীরা ওঘরেই থাকবে।

স্কুল বাড়ীর পাশেই এই স্কুলের দুজন শিক্ষক শ্রীঅনসূয়া প্রসাদ পুরোহিত এবং হায়াৎ সিং পারমার সপরিবারে থাকেন।

ততক্ষণে তাঁরাও এসে গেছেন। ভারী সুন্দর ব্যবহার। কথায় আত্মীয়তার সুর। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা যেন সব এক পরিবার ভুক্ত হয়ে গেলাম।

ভগবান সিং আমাদের একজন সাথীকে ডেকে নিয়ে বললেন—চল আমার সঙ্গে। যা যা দরকার তোমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব। আর শিক্ষকদেরও বলে গেলেন, আমাদের যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় দেখতে।

ভগবান সিং এর ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হলাম। শিক্ষক অনসূয়া প্রসাদজীও বললেন,—লোকটা বড় অতিথিবৎসল এবং কর্তব্য-পরায়ণ। দেখুন না, আজকে ওঁর মরবার ফুরসৎ নেই। তবুও আপনারা আসছেন শুনে আগেই আমাকে বলে গেছেন, দুটো ঘর পরিষ্কার করে রাখতে। আর ছেলে মেহেরবান সিংকেও বলে

রেখেছেন পাঁচ সাত জনের মত চাল' ডাল, আলু, কাঠ যেন যোগাড় থাকে।

দূর থেকে বাজনার শব্দ কানে আসতেই তিনি পুনরায় বললেন— ঐ আসছে।

—কে আসছে?

—ডুমক্ গ্রামের দেবতাকে নিয়ে বাদ্যযন্ত্রসহ শোভাযাত্রা করে আসছে সেই গাঁয়েরই লোকজন।

—ব্যাপারটা কি?

ঐ যে দূরে পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন, তারই মাথার উপর ডুমক্ গ্রাম। এখান থেকে রুদ্রনাথ যেতে হলে ঐ গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

আমাদের এই উর্গমের মতই বর্দ্ধিষ্ণু। কিন্তু গত তিন বছর ধরে পর পর অজন্মা হয়েছে। একদম ফসল হয়নি।

নিশ্চয় দেবতার গায়ে দোষ লেগেছে। তাই ওরা দেবতাকে নিয়ে তীর্থপরিক্রমায় বেরিয়েছে।

—কোথায় কোথায় যাবে?

—আশেপাশের সব কটি তীর্থেই যাবে। ওরা প্রথমে রুদ্রনাথের দিকে গিয়েছিল। এখন এদিকে আসছে। এখান থেকে পাহাড়ী পথে বদ্রীনারায়ণ যাবে।

—এত লোকের থাকা খাওয়া?

—যেদিন যে গাঁয়ে পদযাত্রা শেষ হবে, সেদিন সে গাঁয়ের লোকেরাই খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করবে।

আজ ওরা আমাদের গাঁয়েই থাকবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়ীতেই ব্যবস্থা হয়েছে।

ভাওয়ান সিং ওদের জন্য গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আটা আলু নুন তেল সংগ্রহ করে রেখেছেন।

—ওরা লোক কতজন?

—তা প্রায় ৫০,৬০ জন হবে। ওই ওরা আসছে। চলুন দেখে আসি।

গাঁয়ের সকলকেই দেখছি সেদিকেই ছুটছে। আমরাও গেলাম।

যে বাড়ীটায় ওদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তারি সামনে একটা ছোট মাঠ আছে। সেখানে এসে সবাই জড় হয়েছে।

১৫।১৬ ফুট লম্বা একটা বাঁশের ডগায় পেতলের বিগ্রহ। বাঁশটা রঙীণ কাপড়ে মোড়া। রঙ বেরঙের কাপড় দিয়ে মূর্তিটাও জড়ানো।

একজন লোক নেচে নেচে সেই বাঁশটা অনবরত এপাশ ওপাশ ঘোরাচ্ছে। তাতে মনে হচ্ছে, মূর্তিটি যেন রঙীর্ণ কাপড়ের ঘাঘরা পড়ে নাচছে। সঙ্গে দলীয় লোকেদের বাজনাসহ নৃত্যও চলছে।

উপস্থিত সকলেই পরম আনন্দে এ দৃশ্য উপভোগ করছে। আমরাও কিছুক্ষণের জন্য এই আনন্দমেলায় মিশে গেলাম।

উর্গম। উচ্চতা ৬৩০০ ফুট। শুনতে পাই এখান থেকে পাহাড়ী হাঁটাপথে তীব্বত সীমান্তে যাওয়া যায়। সেই কারণেই নাকি এক-কালে পারমিট প্রথা চালু ছিল।

এই উর্গমেই ধ্যান বদ্রীর মন্দির। আমরা যে স্কুল বাড়ীতে আছি, তার ঠিক পাশেই। এই মন্দির বহু প্রাচীন।

কথিত আছে এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য।

সকলে মন্দির দর্শন করে এলাম।

পঞ্চকেদারের মত সপ্ত বদ্রীও আছে।

কর্ণপ্রয়াগ থেকে বাসে এগার মাইল দূরে আদিবদ্রী। যোশীমঠ থেকে তপোবন হয়ে পাহাড়ী পথে ভবিষ্যবদ্রী। তার পাশেই সুবায়েন গ্রামে আধবদ্রী। বদ্রীনারায়ণের পথে পাণ্ডুকেশ্বরে যোগবদ্রী। অণিমঠে বৃদ্ধবদ্রী। উর্গমে এই ধ্যানবদ্রী এবং বদ্রীনারায়ণে স্বয়ং বদ্রীবিশাল।

ভবিষ্যতে আবার পঞ্চকেদারের সঙ্গে সপ্তবদ্রী পরিক্রমার আশা মনের কোণে দানা বাঁধে।

মালপত্র স্কুলবাড়ীতে রেখে সকলে কল্পেশ্বরনাথ দর্শনে বেরিয়ে পড়ি। গ্রামের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে পথ মন্দির পর্য্যন্ত চলে গেছে। প্রায় সবটাই সমতল রাস্তা। চড়াই উতরাই একেবারে নেই। দূরত্ব দুই কিলোমিটার।

অবশেষে কল্পগঙ্গার তীরে পৌঁছে গেলাম। নদীর উপর ঝুলন্ত পুল। লোহার দড়ি আর কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী। অবশ্য পাশেই, মজবুত লোহার পুল তৈরীর কাজ চলছে। এক বছরের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে শুনলাম।

পুলের এপারে ডান পাশে একটা বাড়ী আছে। কোন এক লালা নাকি তৈরী করে রেখেছেন।

জটিল কর্মময় জীবনে শান্তি পাবার আশায় মাঝে মাঝে এখানে এসে কিছুদিন বাস করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে স্থানায় একজন লোক দেখাশুনা করে থাকে। মালিকের নিজস্ব কামরা ছাড়া বাকী ঘর সাধু সন্ন্যাসী এবং যাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত।

পুল পার হয়ে কয়েকটা ধাপ উপরের দিকে উঠলেই মন্দির প্রাঙ্গণ।

সামনেই তোরণদ্বার। ঘণ্টা ঝুলছে। ভিতরে সরু একফালি উঠোন। বাঁদিকে দু'তিনটা ছোট ঘর, মালপত্র রাখা কিংবা রান্নাবান্না করা চলে।

ডানদিকে কয়েক ধাপ উঠে একটু উঁচুতে একখানা লম্বা ঘর। সেখনে একজন সাধু একজন শিষ্যসহ থাকেন। শুনলাম কিছুদিন থেকে তিনিই দেবতার সেবা করে যাচ্ছেন।

শেষপ্রান্তে মন্দির। অনেকটা রুদ্রনাথেরই মত। গুহা মন্দির। পাথর বসানো প্রবেশদ্বার। ভিতরে বিরাট এক পাথরের নীচে কল্পেশ্বর মহাদেবের অধিষ্ঠান।

স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। এখানে শিবের জটা প্রকাশিত।

গুহার পাশেই আচ্ছাদিত চত্বর। যাত্রীরা এখানে বিশ্রাম নিয়ে তৃপ্তি পান।

বহু প্রাচীন এই তীর্থে লোক সমাগম নেই বললেই চলে। স্থানীয় লোকজন ছাড়া সারা বছরে ৮।১০ জন যাত্রীও আসে কিনা সন্দেহ।

সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর এই তীর্থ। মন্দির, বিগ্রহ, পূজায়োজন কোথাও এতটুকু জাঁকজমক কিম্বা সাজসজ্জার আয়োজন নেই।

আমরা ছাড়া অন্য কোন যাত্রী নেই। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে কয়েকটা ফুল সংগ্রহ করে মন্দিরে প্রবেশ করি। ধূপকাঠি, মোমবাতি জ্বালিয়ে দিই। সংগৃহীত ফুল দেবতার চরণে নিবেদন করি।

কল্পেশ্বরনাথ। কল্পকল্পান্তরব্যাপী মহেশ্বরের এখানেই অধিষ্ঠান।

সতীর দেহত্যাগে অস্থির মহাদেব কঠোর তপস্যায় রত হলেন। কল্প কল্প ধরে চলল এই তপস্যা। এই মহাপুণ্যক্ষেত্র—কল্পতীর্থে।

অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধনায় তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে আকাঙ্ক্ষিত বর দান করেন, ইন্দ্রের সঙ্কল্প পূর্ণ হয়। তিনি যে কল্পেশ্বর নাথ। দেবাদিদেব কল্পেশ্বর মহাদেব।

এই কল্পতীর্থে বসে অনেকেই কঠোর সাধনায় মগ্ন থেকে আত্মার শান্তি লাভ করেছেন। কেউবা কঠোর তিতিক্ষা আর সংযমের মধ্য দিয়ে ধ্যানী কল্পেশ্বরের আরাধনায় তন্ময় হয়ে ছিলেন।

আমরা ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি ধ্যানী মহেশ্বরকে। গৃহিনী পদতলে একখানা ধুতিবস্ত্র রেখে সভক্তি প্রণাম করে।

মনে কৌতূহল জাগে,—মহেশ্বরের লজ্জাভরণ ॥

ধ্যানমগ্ন বিবস্ত্র এই মহাযোগী করুণাঘন দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকেন। ভক্তের আচরণে তাঁরও মনে হয়ত প্রগাঢ় বিস্ময়।

যোশীমঠ—পাণ্ডুকেশ্বর—বদ্রীনারায়ণ

॥ ১৩ ॥

কল্পেশ্বর দর্শন শেষে আবার উর্গমের সেই স্কুলবাড়ীতে ফিরে চলি।

কিছুদূর এগিয়ে একটা বাড়ী পেলাম। বাড়ীর খানিকটা দোকানঘর। একজন যুবা মেসিনে জামা সেলাই করছে। শিশু-কোলে স্ত্রী কাছে বসে কি যেন বুনছে। পাশেই চায়ের সরঞ্জাম রাখা। দুটো ব্যবসায় হয়ত একসঙ্গে চলে। এগিয়ে গিয়ে এককাপ চায়ের কথা বলি। যুবকটি লজ্জাভরে জানায়—দুধ নেই। মহিলা কি যেন ভাবে। দাঁড়াতে বলে চট করে উঠে যায়। ভিতর থেকে দুধ নিয়ে এসে চা বানায়। মনে হল কোলের শিশুর বরাদ্দ থেকে। চা খেয়ে তৃপ্তি পাই। হয়ত বা দোকানীও।

সেই স্কুলবাড়ীতে এসে দেখি ছাত্র শিক্ষক সকলে হাজির। স্কুল বসবাব সময় হয়েছে। আমাদেরও ফিরে যাবার পালা।

ছেলেরা স্কুলের বাগান থেকে কিছু ফুল এবং কয়েকটা শশা এনে আমাদের দিল।

কল্পেশ্বরের চরণে লালিত এই দেবশিশুদের স্নিগ্ধ সরলতায় মুগ্ধ হলাম। তাদের স্মৃতি মনে রাখার জন্য সকলে একসঙ্গে ছবি তুললাম।

ততক্ষণে মোড়ল ভগবান সিংও এসে গেছেন। আবার আসার আমন্ত্রণ জানালেন।

বললাম—এলেই তো আপনাদের কষ্ট। আমাদের সব ব্যবস্থা আপনাদের করতে হয়।

উত্তরে আন্তরিকতার সুর,—কিসের কষ্ট? আপনারা এতদূর থেকে কত কষ্ট করে ভগবানকে দর্শন করতে এসেছেন। আপনাদের সেবা করতে পারাটাই মহাপুণ্যের, মহা আনন্দের, মহা শান্তির।

মুগ্ধ হয়ে তাকাই। কী প্রগাঢ় ভালবাসা এবং বিশ্বাস, এই অশিক্ষিত গ্রাম্য মোড়লের। নিঃস্বার্থ সেবার প্রতি কী অপরিসীম শ্রদ্ধা।

তবে কি পরিবেশের দান? হয়ত তাই। হিমালয় যে দেবালয়। এই দেবভূমিতেই ওরা আজন্ম লালিত। তাইতো তারা স্বর্গীয় সুষমার প্রতীক।

ফিরে চলি। মন পড়ে থাকে আলোছায়ায় ঘেরা হিমালয়ের পথে প্রান্তরে। যেখানে দেবতাকে ঘিরে হাজার হাজার নর-দেবতা। যাদের অন্তরে বিরাজ করে প্রেমময় দেব-হৃদয়।

হেলাং ফিরে এলাম। পঞ্চকেদার পরিক্রমা শেষ। বাকী শুধু আর একবার নারায়ণ দর্শন।

আমরা পদযাত্রা শুরু করেছিলাম ত্রিযুগীনারায়ণের পথে। শেষ হতে চলেছে বদ্রীনারায়ণে। মাঝে পঞ্চকেদার।

আমাদের হাঁটাপথের এখানেই শেষ।

এবার সাথীদের বিদায় দেবার পালা। সকলের মন আসন্ন বিচ্ছেদ চিন্তায় ভারাক্রান্ত। মাত্র ক'দিনেই কী গভীর অন্তরঙ্গতা। তার কারণ, গভীর বিশ্বাস।

দু'টি অচেনা পাহাড়ী মানুষ সামান্য অর্থের বিনিময়ে, যাত্রার শেষপ্রান্তে আমাদের নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছে।

কঠোর পরিশ্রম, অসীম সহিষ্ণুতা, অমানুষিক সেবা আর প্রাণভরা ভালবাসা,—ওদের চরিত্রের অলঙ্কার।

আমরা সমতলের শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষ, ওদের এই শুচিস্নিগ্ধ পাহাড়ী সারল্যকে অশিক্ষা আর নির্বুদ্ধিতার ফসল ভেবে করুণা করি। সভ্যতার কী মর্মান্তিক পরিহাস। কী নির্লজ্জ প্রকাশ।

নভেম্বরের শুরু থেকে গিরিশৃঙ্গের সব ক'টি দেবালয় একে একে বন্ধ হয়ে যাবে। ছ'মাসের শীতকালীন বিরতি। তাই সাথীদেরও এখন ঘরে ফেরার পালা।

মে মাস থেকে আবার যাত্রীসমাগম সুরু। তখন তারাও ঘর ছেড়ে পথে নামবে। হিমালয়ের পথে পথে।

অক্টোবর পর্যন্ত বছরের এই ছ'মাসের সঞ্চয় নিয়ে এবার তারাও ঘরে ফিরে চলেছে। একান্ত প্রিয়জনের মাঝে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, যেন তাদের প্রতীক্ষিত মিলন মধুর হয়।

আমাদের বদ্রীনারায়ণের বাসে তুলে দিয়ে তারা রুদ্রপ্রয়াগের পথে নেমে যাবে।

প্রীতির নিদর্শন হেতু কয়েকটা জিনিস তাদের দিয়ে দিলাম। জামা, প্যাণ্ট, ওয়াটারপ্রুফ, জুতো,—যে কয়টা জিনিস বাড়তি ছিল।

খুব খুশী। বারে বারে কৃতজ্ঞতা জানায়। আমাদের মনও তৃপ্তিতে ভরে ওঠে।

হেলাং থেকে যোশীমঠ চলে এলাম। আজ এখানেই থাকতে হবে।

মালপত্র নিয়ে বিড়লাভবনে চলে গেলাম। জানা জায়গা। বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে একটু নীচে। সাজানো দু'তলা বাড়ী। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সামনে ফুলের বাগান। এই যোশীমঠে যাত্রীদের থাকার পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত জায়গা।

আজকাল অবশ্য কয়েকটা ভাল হোটেলও হয়েছে। তাছাড়া ধর্মশালা কিম্বা অতিথিশালারও অভাব নেই এই যোশীমঠে। তবে সব চাইতে কম খরচে আরামপ্রদ, এই বিড়লা ভবন। ঘর ভাড়া লাগে না। শুধু লাইট ইত্যাদি আনুষাঙ্গিক খরচের জন্য দৈনিক এক টাকা। আগে আটআনা ছিল।

ঘরের মধ্যে কার্পেট পাতা। ঘরের সংলগ্ন কল, পায়খানা। সবকিছুই ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে।

যোশীমঠ। উচ্চতা ৬০০০ ফুটের উপর। হৃষিকেশ থেকে ১৬০ মাইল। বাসে একদিনে হৃষিকেশ থেকে যোশীমঠ পর্যন্ত আসা যায়। পরের দিন এখান থেকে ছ'তিন ঘণ্টার মধ্যেই বদ্রীনাথ পৌঁছে যাওয়া যায়।

যোশীমঠ বেশ বড় শহর। দিন দিন এর কলেবর বেড়েই চলেছে। উঁচু বাস রাস্তা থেকে বহু নীচে অলকানন্দার ধার পর্যন্ত সারি সারি ঘর বাড়ী। প্রধান সড়কে প্রচুর দোকানপাট। শহর জীবনের সব রকম সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এখানে পাওয়া যায়।

দার্জিলিং মুসৌরী কিংবা শিলং যাঁদের আকর্ষণ করে, তাঁরা যদি একবার এই যোশীমঠে আসেন, নিশ্চয় বার বার আসার প্রেরণা পাবেন।

আদিগুরু শঙ্করাচার্য্যের সাধনক্ষেত্র এই যোশীমঠ। এখানেই তিনি জ্যোর্তিমঠ স্থাপন করে মহাদেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

একটু দূরে পাহাড়ের চূড়ায় মঠের অবস্থান। এখানে পাথরের তৈরী শঙ্করাচার্যের প্রতিমূর্তিও বিদ্যমান। মঠের শান্ত সুন্দর পরিবেশ, যেন শান্তির আধার। পুণ্য তপঃক্ষেত্র।

শীতের ছ'মাস বদ্রীনারায়ণের পূজা এই যোশীমঠেই হয়ে থাকে।

নৃসিংহবদ্রী, নবদুর্গা এবং নারায়ণমন্দির যোশীমঠের বিশেষ ধর্মীয় আকর্ষণ।

ভবিষ্যবদ্রী যাবার রাস্তা এই যোশীমঠ থেকেই। এখান থেকে বাসে ৯।১০ মাইল গেলেই তপোবন। সেখান থেকে হাঁটা পথে ভবিষ্যবদ্রী পৌঁছতে হবে।

সকাল ৭টায় যোশীমঠ থেকে বাস ছাড়ল। বাস ক্রমশঃ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিষ্ণুপ্রয়াগ পৌঁছে গেলাম। অলকানন্দা আর বিষ্ণুগঙ্গার সঙ্গমস্থল। এ স্থানের উচ্চতা সাড়ে চার হাজার ফুট।

এখান থেকে আবার চড়াই সুরু। অলকানন্দার পাড় ধরে বাস চলেছে। অবশেষে পাণ্ডুকেশ্বর। জনবহুল জায়গা। ধর্মশালা, পোষ্টঅফিস, দোকানপাট সব আছে।

প্রবাদ আছে পাণ্ডুরাজার নামানুসারে এ স্থানের নাম পাণ্ডুকেশ্বর হয়েছে। অভিশপ্ত পাণ্ডুরাজা এখানে কঠোর তপস্যা করে শাপমুক্ত হন।

কথিত আছে পাণ্ডবেরা এখানে মন্দির নির্মাণ করে নারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সেই যোগবদ্রী। যোগধ্যানী নারায়ণ। যাঁকে দর্শন করলে বদ্রীনারায়ণ যাত্রা সার্থক হয়।

অলকানন্দার প্রবাহ ধরে আরও খানিকটা এগুলে গোবিন্দঘাট। এখানকার প্রধান আকর্ষণ শিখদের গুরুদ্বার। তাছাড়া হেমকুণ্ড লোকপাল, নন্দনকানন যেতে হলে এই গোবিন্দঘাট হয়েই যেতে হয়।

পাণ্ডুকেশ্বর বাসষ্ট্যাণ্ডে ফিরে এলাম। এক্ষুণি বাস ছাড়বে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বদ্রীনারায়ণ পৌঁছে যাব।

• সেবারে কিন্তু এই পাণ্ডুকেশ্বর থেকে মহা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে বদ্রীনারায়ণ পৌঁছেছিলাম।

১৯৭০ সাল। ১৮ই অক্টোবর।

যোশীমঠ থেকে বাসে পাণ্ডুকেশ্বর পৌঁছে শুনলাম বাস আর যাবে না। কী ব্যাপার? না,—প্রতিরক্ষাবাহিনীর নির্দেশে সাময়িক ভাবে বদ্রীনারায়ণের পথে যাত্রীবাহী বাস চলাচল এই মুহূর্ত থেকে বন্ধ।

এখন উপায়? এ তো ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থা।

বদ্রীনারায়ণ কিংবা যোশীমঠ যেদিকেই যাই না কেন সমান হাঁটা পথ। শিশু দুটির কথা বাদ দিলেও মায়ের পক্ষে যে এক পা হাঁটাও সম্ভব নয়। শরীরের যে অবস্থা হয়েছে—।

দু'তিন ঘণ্টা ধরে অনেক চেষ্টা চলল। কিছুতেই সাময়িক

অফিসারদের মত পরিবর্তন করানো গেল না। অগত্যা কিছু যাত্রী হাঁটাপথে বদ্রীনারায়ণ রওনা হল।

আমাদের অবস্থা সঙ্গীন। বিছানাপত্র ছাড়া বাকী মালপত্র যোশীমঠে রেখে এসেছি।

আর এখানে ডাণ্ডি কাণ্ডি কিংবা ঘোড়া কিছুই নেই। এই অবস্থায় কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। হৃষিকেশে কালীকমলীর ধর্মশালায় একজন যাত্রী যে বলেছিলেন,—রোড কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্টের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট মিঃ ব্যানার্জীর কথা। যাঁকে হেডকোয়ার্টার্সে যোশীমঠে খোঁজ করলে পাওয়া যাবে।

আমাদের অবস্থাটা যদি একবার ফোন করে জানাতে পারতাম—।

বাসষ্ট্যাণ্ডের একটু নীচেই মিলিটারী ক্যাম্প। একমাত্র সেখান থেকেই ফোন করা যায়।

অনেক কষ্টে কর্তব্যরত একজন হাবিলদারকে নিয়ে মিঃ ব্যানার্জীকে ফোন করলাম। কানেক্‌সান হতেই হাবিলদার রিসিভারটি আমার হাতে তুলে দিলেন।

কী ভাগ্য! মিঃ ব্যানার্জীকে পেয়ে গেলাম। তাঁকে আদ্যোপান্ত সব বললাম। তাঁর সহৃদয়তার অনেক খবর যে আমি লোকমুখে শুনেছি তাও জানিয়ে দিলাম।

তিনি বললেন—আজ তো রবিবার। অফিস ছুটি। আমি একটা জরুরী কাজে কিছুক্ষণের জন্য অফিসে এসেছি। আজ তো যোগাযোগ হবার কথা নয়। যাই হোক, হয়ত নারায়ণের ইচ্ছা। দেখি কি করতে পারি—। আচ্ছা, ওখানে যে আছে তাকে দিন। আমি রিসিভারটি ফের হাবিলদারের হাতে দিলাম।

উভয়ের কি কথাবার্তা হ'ল জানিনা। তবে কথা বলার সময় হাবিলদার বেশ সমীহ করেই সম্বোধন করছিল।

রিসিভার নামিয়ে রেখে আমাদের বলল,—আসুন আমার সঙ্গে।

পিছু পিছু চলি। রাস্তা ছেড়ে খানিকটা উপরের দিকে উঠে একখানা ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। সামরিক অফিসার কমাণ্ডার গুরুবচন সিং এর ডেরা।

হাবিলদারের মুখে সব শুনে আমাদের বললেন—নিশ্চয় আপনাদের খাওয়া হয়নি। আপনারা বসুন। দেখি আমাদের ক্যান্টিনে কিছু পাওয়া যায় কিনা।

সত্যি বলতে কি, ক্ষিদেয় সকলের পেট জ্বলছে। কোন্ সকালে চা রুটি খেয়ে যোশীমঠ থেকে বেরিয়েছি। এখন ছুটো বাজে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সিংজী ছু'জন লোকসহ ফিরে এলেন। সঙ্গে কিছু ভাত আর ডাল। বললেন—সকলের খাওয়া হয়ে গেছে। কিছু আর পেলাম না।

বাধা দিয়ে বললাম—এই তো অনেকখানি। এতে আমাদের ভালভাবেই হয়ে যাবে।

—আপনারা খেতে থাকুন। আমি রাস্তার দিকে যাচ্ছি। দেখি, আপনাদের পৌঁছে দেবার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

খেতে খেতে ভাবছিলাম,—কী অদ্ভুত যোগাযোগ। বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভরসার নিশ্চয়তা।

মনে মনে নারায়ণকে স্মরণ করি। ভক্তের মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় তিনি পূর্ণ করবেন। দর্শন পাবই।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই সিংজী ফিরে এলেন। বললেন—ব্যবস্থা হয়েছে। এইমাত্র পি ডব্লু ডির একখানা ট্রাক নীচের দিকে গেল। জ্বালানী কাঠ নিয়ে এক্ষুণি ফিরবে। ফেরার পথে আপনাদের নিয়ে যাবে।

রাস্তায় নেমে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। সঙ্গে সিংজীও। একটু পরেই ট্রাক এল। ট্রাকের মধ্যে ৬।৭ খানা গাছের গুড়ি। একপাশে ঠেলে-সরিয়ে দিয়ে আমরা জায়গা করে নিলাম।

ট্রাক ছাড়ল। সজল চোখে সিংজীকে ধন্যবাদ জানালাম। বহুদূরের সেই অদেখা মানুষটাকে, যাঁর দয়ায় সিংজীকে পেয়েছি, কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলাম।

ট্রাক ছুটে চলেছে। ঝাঁকুনিতে গাছের গুড়িগুলি বার বার সরে এসে ধাকা মারছে। বেশ মোটা এবং ভারী। জোরে এসে লাগলে আর রক্ষে থাকবে না। অগত্যা সারাটা পথ যতটা সম্ভব হাত দিয়ে ঠেলে ধরে বসে রইলাম।

সেবারে ফেরার সময় অবস্থা আরও কাহিল হয়েছিল।

অনেক চেষ্টা করে একটা আলুবোঝাই লরীর সঙ্গে ব্যবস্থা করলাম। যোশীমঠ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। তবে আলুর সঙ্গে ত্রিপল ঢাকা অবস্থায় যেতে হবে। নিঃশ্বাস নেবার সুবিধার জন্য এককোণে ত্রিপলের বাঁধন একটু ঢিলে থাকবে। কিন্তু হনুমানচটি আর পাণ্ডুকেশ্বর, এ দুটি চেক্‌পোষ্টে ঢোকার আগে কিছুক্ষণের জন্য তাও থাকবে না।

কারণ, মাল বহনের লরীতে যাত্রীবহন আইন বিরুদ্ধ। লাইসেন্স পর্যন্ত বাতিল হতে পারে।

এত ভয় যেখানে, টাকার অঙ্ক একটু বাড়বেই। অগত্যা বাধ্য হয়ে রাজী হলাম।

আলুর সঙ্গে ত্রিপল ঢাকা অবস্থায় অতিকষ্টে সে যাত্রা যোশীমঠে পেঁীছলাম। নিজেদের নিজেরাই চিনতে পারছি না। সারা গায়ে ধুলোর আস্তরণ। যেন সারাদিন সিমেন্টভর্তি গুদামে কাজ করে সবে বেরিয়েছি।

সেদিনের সব কথা একে একে মনে পড়ে গেল। সেদিনের সেই দুশ্চিন্তা আজ আর স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত করে তুলছে না। বরং বিরাট বৈচিত্র্য নিয়ে স্মৃতিপথে জ্বল জ্বল করছে।

বাস ছাড়ল। এখান থেকে বদ্রীনারায়ণ পর্যন্ত একটানা চড়াই। প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঠতে হবে।

পাণ্ডুকেশ্বর থেকে ৯ কিলোমিটার এগুলে হনুমান চটি। উচ্চতা ৮৩৬০ ফুট।

রাস্তার ধারে পবন নন্দন হনুমানের মন্দির। আশেপাশে কয়েকটা দোকানঘর। চটি আছে, তবে যাত্রীরা কেউ এখানে থাকেন না, সোজা বদ্রীনারায়ণ চলে যান।

হনুমান চটি ছাড়িয়ে কিছুটা গেলে তীব্র চড়াই শুরু। ঘন ঘন মোড় ঘুরে উঠতে হয়। ওসব বাঁকগুলি অপ্রশস্ত হওয়ার দরুণ অনেক সময় দু'বারের চেষ্টায় পিছিয়ে এসে গাড়ী ঘোরাতে হয়।

রাস্তার একদিকে খাড়া পাহাড়। অন্যদিকে নীচে বহু নীচে অলকানন্দার প্রবাহ।

বাস চলেছে যেন গাড়ীবারাণ্ডার ছাদের তলা দিয়ে। পুরো রাস্তা জুড়ে পাহাড় যেন ছত্রাকারে দাঁড়িয়ে আছে।

'জয় বদ্রী বিশাল'—। যাত্রীরা আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠে। ঐ তো মন্দির দেখা যাচ্ছে।

এখান থেকে দেবালয় দেখা যায়। তাই এস্থানের নাম দেওদর্শন। এখান থেকে বাসষ্ট্যাণ্ড পর্য্যন্ত রাস্তা প্রায় সমতল।

বদ্রীনাথ। উচ্চতা ১০২৪৪ ফুট। বহুদূর বিস্তৃত উপত্যকা। প্রচুর ঘরবাড়ী দোকানপাট, পোষ্টঅফিস, হাসপাতাল এবং অসংখ্য যাত্রীনিবাস। যেন ছোটখাট একটা শহর।

অলকানন্দার গা থেকে মন্দিরের সোপান সুরু। মন্দিরের গায়ে নয়নাভিরাম কারুকার্য। প্রবেশপথে বিরাট এক ঘণ্টা ঝোলানো আছে। যাত্রীরা ঘণ্টা বাজিয়ে প্রবেশ করেন।

মন্দিরের প্রবেশদ্বারে গরুড়মূর্তি।

মূল মন্দিরকে সামনে রেখে বাঁদিক থেকে প্রদক্ষিণ সুরু করলে প্রথমেই নারায়ণপত্নী লক্ষ্মীদেবীর মন্দির। পাশে ভোগমণ্ডী। তারপর আদিগুরু শঙ্করাচার্য্যের মন্দির, ভিতরে শ্বেতপাথরের অপরূপ মূর্তি।

পাশে পরপর কয়েকটি মন্দির কমিটির অফিসঘর। তাছাড়া যাত্রীদের বসবার খোলা দালান। তারপর ঘণ্টাকর্ণের মূর্তি।

মধ্যস্থলে গর্ভমন্দির। বিগ্রহ নারায়ণ। বদ্রীনারায়ণ। বদ্রী-বিশাল।

মন্দিরের সামনে একটু নীচের দিকে তিনটি গরমজলের কুণ্ড আছে। তপ্তকুণ্ড, প্রহ্লাদকুণ্ড, নারদকুণ্ড। এখানে যাত্রীরা স্নান করে আরাম পান।

এ ছাড়া আরও দুটি কুণ্ড আছে। কর্মধারা ও ঋষিগঙ্গা।

পঞ্চকুণ্ডের মত পঞ্চশিলাও আছে। নারদশিলা, বরাহশিলা, গরুড়শিলা, মার্কণ্ডেয়শিলা ও নৃসিংহশিলা।

মন্দির থেকে সিঁড়ি দিয়ে তপ্তকুণ্ডে নামার পথে পাশে কেদারেশ্বরের মন্দির।

তৎসংলগ্ন লক্ষ্মীনারায়ণ এবং অন্নপূর্ণার মন্দির।

মন্দিরের সামনে থেকে বাজারের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণদিকে একটা রাস্তা চলে গেছে। সেইপথে একটুখানি এগিয়ে গেলে ঋষিপ্রয়াগ।

নীলকণ্ঠ পর্বত থেকে ঋষিগঙ্গা নেমে এসে এখানে অলকানন্দার সঙ্গে মিশেছে।

মন্দিরের উত্তরদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে অলকানন্দার তীরে ব্রহ্মকপাল। এখানে পিতৃপুরুষের তর্পণাদি এবং পিণ্ডদান বিধেয়।

এই রাস্তা ধরে আরও ৪ কিলোমিটার এগুলে মাতামন্দির। এখান থেকে ডানদিকে সরস্বতী নদীর উপর ভীমপুল। মহাপ্রস্থানের পথে মধ্যমপাণ্ডব ভীম নাকি স্বহস্তে এই পুল তৈরী করেছিলেন।

সরস্বতী নদীর পাশেই মানাগ্রাম। এই পথের শেষ গ্রাম। এখান থেকে চড়াইপথে বসুধারা। বসুধারা থেকে আরও কিছুটা দূরে শতোপন্থ হিমবাহ।

মহাপ্রস্থানের পথে এই হিমবাহেই নাকি ভীমের পতন হয়েছিল। এই পথে আরও বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেলে শতোপন্থ হ্রদ।

কথিত আছে, এই হ্রদের অনতিদূরেই স্বর্গারোহিনী। যুধিষ্ঠিরের পায়ে চলা পথের এখানেই শেষ। এখান থেকেই দেব-সান্নিধ্যে তিনি রথে করে স্বর্গে আরোহণ করেন।

খুব ভোরে গরম জামা কাপড় জড়িয়ে মন্দিরে যাই। মন্দির-প্রাঙ্গণে অল্পবিস্তর দর্শনার্থীর ভীড়। আস্তে আস্তে আরও বাড়তে থাকে।

পূজারী রাওয়ালজী প্রবেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি ওঠে— বদ্রীবিশাল কি জয়।

ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়ে যায়। কে আগে এগিয়ে যাবে।

দেখলাম রাওয়ালজীর আশীর্বাদধন্য কিছু যাত্রী সকলকে ঠেলে একদম সামনে গিয়ে হাজির হল। হয়ত অতি নিকটে না গেলে অধিক পুণ্য সঞ্চয় হয় না।

স্তোত্র পাঠ আরম্ভ হল। মেঘমন্দ্র স্বরে ধ্বনিত হল বেদমন্ত্র। পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপশিখা, সৃষ্টি করে স্বর্গীয় সুষমা। মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে দেখি।

ভগবান পদ্মাসনে বসে আছেন। ধ্যানগম্ভীর যোগীমূর্তি। বিশাল বক্ষ। মাথায় জটা।

কাল কষ্টিপাথরের স্বয়ম্ভু মূর্তি।

প্রাণভরে দর্শন করলাম। সংগ্রহ করলাম দেবতার ফুল ও প্রসাদ।

হে নারায়ণ, হে বদ্রীবিশাল, শক্তি দাও প্রভু, যেন দুঃখকে জয় করতে পারি, যেন শান্তি পাই।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি। উন্মুক্ত আকাশের নীচে, প্রকৃতির বিশাল আঙিনায় দাঁড়িয়ে, কল্পনার মুগ্ধনেত্রে চারিদিকে তাকাই।

এখানেও দেবালয়ের প্রতিচ্ছবি। দিগন্তব্যাপী তুষারশুভ্র হিমগিরি। গা বেয়ে নেমে এসেছে অসংখ্য অমৃতধারা। বহুর মিলনে এক হয়ে বয়ে চলেছে, গঙ্গা…যমুনা…মন্দাকিনী…অলকানন্দা।

চারিদিকে কী নিঃসীম নিস্তব্ধতা। এ যেন বিশাল উন্মুক্ত দেবালয়। যেন বহুদূর বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে বসে আছেন,—মানবাত্মার পরম আত্মীয়, শান্তির আধার, ধ্যানমগ্ন মহাযোগী।

—হে সর্বকালের অধীশ্বর,—হে মহাপ্রভু, তোমায় শতকোটি প্রণাম।